গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা ২৩ - ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

সকল দেশের বিপ্লবী সংগ্রামে উজ্জ্বল তারার মতো বিরাজ করবেন মহান নেতা মাও সে তুঙ

স্মরণদিবসের সভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা, চীন-বিপ্লবের রূপকার কমরেড মাও সে-তুঙের ২৯ তম মৃত্যু দিবসে এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় অফিসে, সকল রাজ্য অফিসে ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলিতে রক্তপতাকা উত্তোলন করা হয়, মহান নেতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানানো হয়। এদিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে কলকাতায় এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হয়, সভা চলাকালীনও বৃষ্টির বিরাম ছিল না। বৃষ্টির মধ্যেই প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে সভা চলে। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ, সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুকোমল দাশগুপ্ত, কেন্দ্রীয় স্টাফ কমরেড মানিক মুখার্জী ও কমরেড প্রতিভা মুখার্জী।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত আমাদের দল সর্বহারার আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষের বুকে আমরা যে বিপ্লবী আন্দোলন সংগঠিত করছি, তা বিশ্বসর্বহারা বিপ্লবেরই অঙ্গ, এবং এই অর্থেই আমরা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের, সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীদার। আমাদের নেতা ও শিক্ষক, মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ যিনি ভারতের বিশেষ পরিস্থিতিতে সর্বহারা বিপ্লবের বিশেষ লাইন, আদর্শ ও সংস্কৃতি আমাদের পাথেয় হিসাবে দিয়েছেন, তিনি নিজে মহান মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুঙের ছাত্র ছিলেন। এখানেই বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান পথপ্রদর্শক ও নেতাদের স্মরণ দিবস উদ্‌যাপনের আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্য।

বিংশ শতাব্দীতে যে তিনটি চরিত্র গোটা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শোষকশ্রেণীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, অন্যদিকে কোটি কোটি শোষিত মানুষের বুকে আশা-ভরসা-মুক্তির দুর্বার আকাঙক্ষা জাগিয়েছিল, তাঁদের একজন মহান লেনিন, দ্বিতীয়জন হলেন লেনিনেরই সুযোগ্য ছাত্র ও অনুগামী মহান স্ট্যালিন, এবং এর পরেই যে নামটি উচ্চারিত হয়, তিনি হচ্ছেন চীন বিপ্লবের রূপকার মহান মাও সে-তুঙ। আজকের ছাত্র-যুবকরা ইতিহাসের এই অধ্যায়ের সাথে পরিচিত নন। চল্লিশ থেকে সত্তর এই চার দশক ধরে গোটা বিশ্বে মাও সে-তুঙ একটা নাম, কোটি কোটি শোষিত মানুষের প্রেরণার উৎস ছিল। আমাদের কৈশোরে, আমরা যখন এস ইউ সি আই-এর মাধ্যমে সাম্যবাদী আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছি, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের যেসব অনুসরণীয় চরিত্রের কথা বলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম মহান মাও।

কমরেড শিবদাস ঘোষ একটি আলোচনায় বলেছিলেন, বিপ্লবী রাজনীতি উচ্চতর হৃদয়বৃত্তি। কথাটি কত বড় সত্য, তা বোঝা যায় মাওয়ের জীবন থেকে। মাওয়ের যখন কৈশোর, চীন তখন অত্যন্ত পিছিয়ে- পড়া অনুন্নত দেশ। ভারতবর্ষ অষ্টাদশ শতাব্দীতে যেমন ছিল, অনেকটা তেমন। মাঞ্চু রাজতন্ত্রের শাসনে চীনে তখন 'ওয়ারলর্ডদের' মানে সামন্তপ্রভুদের দাপট, নিজস্ব সেনাদল নিয়ে তারা এক একটি অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করে। খণ্ড-বিখণ্ড চীনকে তখন বিদেশি সাম্রাজ্যবাদীরাও নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়েছে। একদিকে দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-অত্যাচার, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-লুণ্ঠনে চীনের মানুষ তখন জর্জরিত। বিশাল কৃষিপ্রধান দেশে শিল্প নেই বললেই চলে। শিক্ষা নেই, যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এইরকম একটি দেশে কিশোর বয়সেই মাও সে-তুঙকে যেটা প্রচণ্ডভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল, তাঁর মনে প্রবল আবেগ-ব্যথার সঞ্চার করেছিল, তাহল,

তিনের পাতায় দেখুন

জনগণের দুঃখকষ্ট সম্পর্কে উদাসীন সরকার

আবার বাসভাড়া বাড়াচ্ছে

আবার বাড়তে চলেছে বাসভাড়া। কর-খাজনা-মূল্যবৃদ্ধির ভারে অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষের ঘাড়ে আরও একবার কোপ বসাতে চলেছে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকার। পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়বে, একথা ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে রাজ্য সরকারের পরিবহণমন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে, বাসের ভাড়া বাড়বেই।

এমনিতেই ভাড়ার হার অত্যন্ত চড়া। তা আরও বাড়ানো হলে যাত্রীসংখ্যা ব্যাপকভাবে কমে যাবে— এই আশঙ্কায় নজিরবিহীনভাবে এবার বাস-মালিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ভাড়া না বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। হিসাব করে বাস-মালিকরা দেখিয়েছেন যে, রাজ্য সরকার ডিজেল থেকে চড়া-হারে যে বিক্রয়কর ও সেস আদায় করে তাতে লিটার পিছু তেলের দাম প্রায় ৯ টাকা করে বেড়ে যায়। এই কর ও সেস তুলে নিলে এবং পুলিশের ঘুষ এবং অন্যায়ভাবে যথেচ্ছ অর্থ আদায় করা বন্ধ করলে তেলের দাম বাড়া সত্ত্বেও বাসভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। বাসমালিকরা লক্ষ্য করেছেন যে, ইতিমধ্যেই যাতায়াতের অস্বাভাবিক খরচের জন্য বাসযাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত কমছে, কলকাতা ও মফস্বলের রাস্তাঘাট জনবহুল ও যথেষ্ট দুর্ঘটনাপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও বাস-অটোরিক্সার খরচ বাঁচাতে ক্রমাগত আরও বেশি মানুষ কর্মক্ষেত্রে পৌঁছাতে সাইকেল ব্যবহার করছেন। ফলে তাঁদের ব্যবসার স্বার্থেই তাঁরা চান না যে বাসভাড়া আরও বাড়ুক। সাধারণ মানুষের স্বার্থে ভাড়াবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আমাদের দল এস ইউ সি আই দফায় দফায় যে আন্দোলনগুলি গড়ে তুলেছে, তা যে কতটা যথার্থ এবং প্রয়োজনীয়, বাসমালিকদের ভাড়া না বাড়ানোর প্রস্তাবে সে-কথা স্পষ্ট। অথচ, এক কথায় এই প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে পরিবহণমন্ত্রী চূড়ান্ত স্বৈরাচারী শাসকদের মত অত্যন্ত দম্ভের

সাতের পাতায় দেখুন

মুর্শিদাবাদে আইনঅমান্যে পুলিশের বর্বর আক্রমণ

১৫ সেপ্টেম্বর বহরমপুর গ্রান্ট হল থেকে গণআইন অমান্যের এক বিশাল মিছিল বের হয়। ভাঙনপীড়িত, আর্সেনিক আক্রান্ত ফসলের দাম-না-পাওয়া অভাবী মানুষ, ছাত্রযুবকদের আইন অমান্যকে আইনত মোকাবিলা না করে নির্মমভাবে লাঠিপেটা করে অভ্যর্থনা জানিয়েছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের পুলিশ। ডি এস পি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স মিছিলের ওপর হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে এস ইউ সি আই-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির পাঁচজন সদস্য সহ ৬৩ জন আন্দোলনকারীকে আহত করে। এর মধ্যে গুরুতরভাবে আহতদের হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

ভাঙন মুর্শিদাবাদের হাজার হাজার মানুষকে পথের ভিখারি করেছে, গ্রামের পর গ্রাম শেষ হয়েছে, কেবল জলঙ্গিতেই মারা গেছে দশ জন, রোগে নয়, অনাহারে। হরিহরপাড়ায় একটি পরিবারেই ১৮ জন মারা গিয়েছে। এই জেলা আর্সেনিক বিষে জর্জরিত। ফসলের দাম নেই, চাষের বিদ্যুতের দাম আকাশছোঁয়া, মজুরের কাজ

দুয়ের পাতায় দেখুন

হরিণঘাটায় লাঠিচার্জ, বন্‌ধ — *আটের পাতায়*

১৫ সেপ্টেম্বর বহরমপুরে এস ইউ সি আই-এর শান্তিপূর্ণ আইনঅমান্যে পুলিশের নৃশংস লাঠিচার্জ

ধ্বংসের মুখোমুখি কৃষক

নদীয়ার বানগড়িয়ার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী কাশীনাথ ঘোষ ধান চাষের খরচের একটা মোটামুটি হিসাব তৈরি করেছেন। স্থানভেদে এই হিসাবের কিছুটা কমবেশি হলেও কৃষকের নিঃস্ব হওয়ার প্রক্রিয়া বুঝতে এটি সাহায্য করবে। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে এখানে ছেপে দেওয়া হল।

ধরা যাক, একজন কৃষক ৬ বিঘা জমি ধান চাষ করেন।

জমি চষার খরচ	=	৪০০ টাকা
বীজ (১০ কেজি)	=	১৩০ টাকা
১০ : ২৬ সার (১৫ কেজি)	=	১৫০ টাকা
ইউরিয়া (৩৫ কেজি)	=	২০০ টাকা
পটাশ (১০ কেজি)	=	৬০ টাকা
অনুখাদ্য	=	৮০ টাকা
কীটনাশক	=	২০০ টাকা
বীজবোনা, ফসল কাটা ও বাঁধা, ঝাড়াই বাবদ শ্রমিক খরচ (১৩২ একক)	=	৭,৯২০ টাকা
বিবিধ	=	২০০ টাকা
অতএব একবার চাষে খরচ	=	৯,৩৪০ টাকা
সুতরাং দু'বার চাষে খরচ (৯,৩৪০ x ২)	=	১৮,৬৮০ টাকা
এর সঙ্গে যোগ হবে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ মাশুল	=	১২,০০০ টাকা
পরিবহন খরচ	=	১,০০০ টাকা
দু'বার চাষে মোট খরচ	=	**৩১,৬৮০ টাকা**

* * * * *

বিঘা প্রতি ভাল ফলন (১৫ মণ)	=	৬০০ কেজি
১ কেজির দাম	=	৫ টাকা
বিঘা প্রতি আয়	=	৩,০০০ টাকা
৬ বিঘা থেকে আয়	=	১৮,০০০ টাকা
দু'বার চাষে আয়	=	৩৬,০০০ টাকা
বছরে নীট আয়	=	৪,৩২০ টাকা
মাসে রোজগার	=	৩৬০ টাকা

(সূত্র ঃ আনন্দবাজার ১৩-৯-০৫)

এই রোজগারে একটা চাষী পরিবার বাঁচবে কীভাবে? পরিবারের ভরণপোষণ, চিকিৎসা, সন্তানের শিক্ষা, আত্মীয়স্বজন, লোক-লৌকিকতা প্রভৃতি সম্পন্ন করার পর আদৌ কি সম্ভব পুনরায় চাষ করা? ফলে চাষী ক্রমাগত ঋণগ্রস্ত হচ্ছে, জমি হারাচ্ছে, মজুরে পরিণত হচ্ছে।

কৃষিজমি কেড়ে নেওয়ার পরিণাম

কৃষি সুমারি অনুযায়ী ১৯৯৫-'৯৬ এবং ২০০০-'০১ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫৮,৩২৪ একর কৃষি জমি অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অর্থাৎ ৫ বছরে কৃষি জমি নষ্ট হয়েছে ২,৯১,৬২০ একর। এভাবে কৃষিজমিকে অকৃষি জমিতে রূপান্তরের ফলে গত ১৫ বছরে ২৪ লক্ষ নতুন ভূমিহীন খেতমজুর তৈরি হয়েছে। (সূত্র ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান ১৫-৯-'০৫)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে

পশ্চিমবঙ্গ মাছ আমদানি করে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, গম আমদানি করে পাঞ্জাব থেকে। (বর্তমান, ৩০-৮-'০৫)

২০০৪-'০৫ আর্থিক সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে অক্টোবর ২০০৩ — সেপ্টেম্বর ২০০৪ এই বারো মাসে ২৫ লক্ষ ৪২ হাজার টন খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছিল। ওই সময়ে রাজ্যের অভ্যন্তরে এফ সি আইয়ের সংগ্রহ ছিল ২ লক্ষ ৯০ হাজার টন চাল। অর্থাৎ আমদানি করতে হয়েছিল ২২ লক্ষ ৫২ হাজার টন চাল। (সূত্র ঃ বিধানসভার গত বাজেট অধিবেশনে পরিবেশিত এই হিসাবটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ফলিত অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রাক্তন অধিকর্তা সচ্চিদানন্দ রায়, ১৫ সেপ্টেম্বর '০৫ আনন্দবাজার পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন)

"কৃষি সমীক্ষা অনুসারে গত ২০ বছরে যে কোন ধরনের ফসলের উৎপাদন ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ হারে কমে এসেছে" (আনন্দবাজার পত্রিকা ৩-৬-'০৫)। আগে সূচক ধরা হত ১ হেক্টর, এখন ধরা হয় ০·৮৫ হেক্টর। তাতেও উৎপাদনবৃদ্ধি দেখাতে পারছে না। কৃষি জমিকে বেশি পরিমাণে অকৃষি জমিতে রূপান্তরিত করলে উৎপাদন হার বাড়লেও খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা বিঘ্নিত হবে। এর পরিণতি ভয়ঙ্কর।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের অবস্থান

১ বিঘারও কম জমির মালিক	৮০ শতাংশ
১ - ২ বিঘা জমির মালিক	১১ শতাংশ
২ - ৫ বিঘা জমির মালিক	২ শতাংশ

(আনন্দবাজার ৩-৬-০৫)

দেখা যাচ্ছে, ৯১ শতাংশই প্রান্তিক চাষী যাদের মজুরি না করলে সংসার চলে না। অথচ সিপিএম বলছে, গ্রামাঞ্চলে কৃষকের নাকি ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে।

কৃষক কেন ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না

বিপণন ব্যবস্থার মধ্যে এক বিশাল সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী, দালাল, ফড়ে, ব্যবসায়ী, মহাজন ঢুকে পড়ায় কৃষকরা ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছে না। লাভজনক দামে সরকার কি কেনার ব্যবস্থা করেছে? সরকার বিপণন দপ্তরে বরাদ্দ কমিয়ে দিয়ে কৃষকদের দালাল চক্রের শোষণের সামনে ঠেলে দিয়েছে।

২০০১-'০২ সালে বিপণন দপ্তরে বরাদ্দ — ২৯৮ কোটি টাকা

২০০৫ সালে বিপণন দপ্তরে বরাদ্দ — ২৮৮ কোটি টাকা

(বর্তমান, ২৬-৭-'০৫)

কৃষক-বঞ্চনার শরিক কেন্দ্রীয় সরকার

খোলা বাজারে এক কুইন্টাল পাটের দাম যখন ১৫৩০ টাকা, তখন কেন্দ্রীয় সরকার পাটের সহায়ক মূল্য ধার্য রেখেছে কুইন্টাল প্রতি ৯৮০ টাকা

(আনন্দবাজার পত্রিকা ৭-৮-'০৫)

২০০১-'০২ আর্থিক বছরে সাধারণ মানের ধানের সহায়ক মূল্য ধার্য ছিল কুইন্টাল প্রতি ৫১০ টাকা এবং চালের দাম কুইন্টাল প্রতি ৮২৮·৮০ টাকা। সরকার সময়মত ধান না কেনায় চাষীরা মিল মালিকদের কাছে ৩৯২·৫০ টাকা থেকে ৪৭৫ টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয়। পরে সরকার মিল মালিকদের কাছ থেকে সহায়ক দামে ২ লক্ষ ৪০ হাজার টন চাল কেনে। ফলে সহায়কমূল্য বাবদ ২১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা যেটা চাষীদের পাওয়ার কথা ছিল তা ঢুকে যায় মালিকদের পকেটে।

(ক্যাগ রিপোর্ট — ২০০৩)

কেন্দ্রীয় সরকার চটকল মালিকদের প্রতি সদয়

চটশিল্পের আধুনিকীকরণ করার নামে কেন্দ্রীয় সরকার গত ১০ বছরে মালিকদের ৩৫০ কোটি টাকা দিয়েছে। ... পুরো টাকাই মালিকরা পকেটস্থ করেছে। (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৮-৭-'০৫)

কৃষক আরও সর্বস্বান্ত হবে

শ্যালোর বিদ্যুৎগ্রাহককে ২০০৪-'০৫ সালে দিতে হতো বছরে ৫,৪৬০ টাকা,

২০০৫-'০৬ সালে দিতে হচ্ছে বছরে ৮,৯৫০ টাকা।

সাবমারসিবল গ্রাহককে ২০০৪-'০৫ সালে দিতে হতো বছরে ৬,৮১০ টাকা,

২০০৫-'০৬ সালে দিতে হচ্ছে বছরে ১০,৯৩০ টাকা।

কৃষি বিদ্যুতের মাশুল পশ্চিমবঙ্গে ইউনিট প্রতি	৩·৫০ টাকা,
অথচ পাঞ্জাবে ইউনিট প্রতি	২৫ পয়সা,
বেশিরভাগ রাজ্যে ইউনিট প্রতি	৫০ পয়সা;

অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে বিনাপয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া হচ্ছে।

দিল্লি সরকারও কৃষি বিদ্যুতে ২০ শতাংশ মাশুল কমিয়েছে।

(সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির দেওয়া হিসাব)

অথচ পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ মাশুল ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে। এই কি রাজ্য সরকারের কৃষক দরদের নমুনা?

জেলায় জেলায় বিদ্যুৎ আন্দোলনের জয়

নদীয়া ঃ কৃষি বিদ্যুতের অস্বাভাবিক হারে মাশুল বৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা রাজ্যের কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকেরা বর্ধিত মাশুল বয়কট শুরু করে গত জুলাই থেকে। গত ২৫ আগস্ট ছিল সারা বাংলার কৃষি গ্রাহকদের মহাকরণ অভিযান। কালিগঞ্জ থানার কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকরা সেই আন্দোলনে যোগ দিতে যখন কলকাতায় চলে আসে, সেই সুযোগে পর্ষদের অফিসারেরা কালিগঞ্জ তথা দেবগ্রামের কিছু কৃষি গ্রাহকের লাইন কেটে দেয়। চোরের মতো এই আক্রমণের প্রতিবাদে ২৯ আগস্ট শতাধিক কৃষি-বিদ্যুৎ গ্রাহক নদীয়া জেলার দেবগ্রামে অবস্থিত বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিস সারাদিন ঘেরাও করে রাখে। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন থানা কমিটির সম্পাদক সন্দীপ সাহা, মহিউদ্দীন মণ্ডল, জগন্নাথ ঘোষ, হররোজ আলী শেখ প্রমুখ। সমাধানের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে সন্ধ্যা ৬টায় ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়। পরের দিন কল্যাণীতে সার্কেল ম্যানেজারের সাথে আলোচনা হয় এবং পর্ষদ কাটা লাইন জুড়ে দিতে বাধ্য হয়।

হুগলি ঃ গত ২৩ আগস্ট হুগলির বিল বয়কট আন্দোলনে অংশ নেওয়ার জন্য ৩২৯ জন বিদ্যুৎগ্রাহকের লাইন কেটে দেওয়া হয়। এর প্রতিবাদে পরদিনই শতাধিক গ্রাহক কমলকৃষ্ণ মল্লিক এবং মণিমোহন ঘোষের নেতৃত্বে এ. ই.-কে ঘেরাও করেন। দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও থাকার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার লাইন জুড়ে দিতে লিখিত নির্দেশ দেওয়ার পর ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

হুগলি ঃ কৃষকদের উপর অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, ক্ষুদ্রশিল্প গ্রাহকদের এইচ.পি পিছু ১০ টাকা ফিক্সড্ চার্জ প্রত্যাহারের দাবিতে ১১ আগস্ট আরামবাগ ডিভিশনাল ম্যানেজারের নিকট ৫ শতাধিক এবং চন্দননগর ডিভিশনাল ম্যানেজারের নিকট ৬ শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহক বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচী পালন করেন। ঐ দিন গ্রাহকেরা বিশাল মিছিল করে ডি. এমের কাছে ২৪ দফা দাবিসহ স্মারকলিপি পেশ করেন।

ঐ দিন ডিভিশনাল ম্যানেজারকে ঘেরাও করা হলে পুলিশের বিশালবাহিনীর সঙ্গে গ্রাহকদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায়। ডি.এম গ্রাহকদের সঙ্গে আলোচনার প্রস্তাব দেন। প্রতিনিধি দল আলোচনায় অংশ নেন। বৈঁচী গ্রুপ সাপ্লাইয়ের লাইন কেটে দেওয়া ৩ জন গ্রাহকের লাইন জুড়ে দেওয়ার দাবি ডি এম মেনে নেন। এই কর্মসূচি উপস্থিত গ্রাহকদের প্রবলভাবে উদ্দীপিত করে তোলে।

পুরুলিয়া ঃ ২০০০ সালে পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানায় বেশ কিছু বিদ্যুৎগ্রাহক অ্যাবেকার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পুঞ্চায় পথঅবরোধ, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিল বয়কট, বিদ্যুৎ অফিস ঘেরাও ইত্যাদি চলতে থাকে। লাগাতার আন্দোলনের ফলে ঐ ভুতুড়ে বিলগুলির সংশোধন, বন্ধ মিটার পরিবর্তন গত মাসে সম্ভব হয়েছে। বিলগুলি যা সংশোধন হয়ে এসেছে তা মূল বিলের এক তৃতীয়াংশেরও কম। এই জয় পুঞ্চার বিদ্যুৎ গ্রাহকগণের উল্লেখযোগ্য জয়।

উত্তর ২৪ পরগণা ঃ ১লা সেপ্টেম্বর হাঁসখালির কৃষি বিদ্যুৎ গ্রাহকদের মূল সংগঠকেরা কলকাতায় ভারতসভা হলের মিটিং-এ আসেন। সেই সুযোগে পর্ষদ কর্মচারীরা গ্রামে গিয়ে ২/১টি লাইন কাটার পরেই কয়েকশ' মানুষ জড়ো হয়ে পর্ষদ কর্মচারীদের ঘেরাও করে। কয়েক ঘণ্টা ঘেরাও চলার পরে পর্ষদ কর্মচারীরা লাইন জুড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই সংবাদ কলকাতার মিটিং-এ পৌঁছালে উপস্থিত সকলেই হাঁসখালির জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

নদীয়া ঃ চাকদহের দোয়ারডাঙ্গা অঞ্চলে গত ২ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় পর্ষদ কর্মীরা পুলিশ নিয়ে লাইন কাটতে যায়। কয়েকটি লাইন কাটার পরে কয়েকশ' মানুষ পুলিশ সহ পর্ষদ কর্মচারীদের ঘেরাও করে। পুলিশ চাকদহ থানায় খবর পাঠালে ওসি প্রচুর পুলিশ নিয়ে আসেন। এতেও কৃষকদের টলানো যায়নি। স্থানীয় সংগঠকরা রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্বের সাথে যোগাযোগ করে ঘেরাও চালিয়ে যান। জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মিহির সিংহ দ্রুতগতিতে ঘেরাওস্থলে উপস্থিত হন। বেলা ৩টার সময় পর্ষদ কর্মচারীরা কাটা লাইন জুড়ে দিতে বাধ্য হয়।

মুর্শিদাবাদে আইন অমান্যে পুলিশের বর্বর আক্রমণ

একের পাতার পর

নেই। কেবল মরার দরজাটাই খোলা আছে, তাও মরতে হবে নীরবে, শান্তিভঙ্গ না করে। এইটেই মানতে চাননি মানুষ, সংগ্রামের শক্তি এস ইউ সি আইকে তাঁরা আঁকড়ে ধরেছেন। ১৫ সেপ্টেম্বরের আইন অমান্য তাই শাসকদলের কাছে আতঙ্ক। কেবল লাঠিচার্জই নয়, আন্দোলনকারী মহিলা কর্মীদের সম্ভ্রম নষ্ট করেছে পুলিশ। যে জেলা নারীপাচারে রাজ্যে শীর্ষস্থানে সে জেলায় নারীর মর্যাদা প্রশাসন দেবে না জেনেই তাঁরা লড়াইয়ে এসেছেন। যাঁরাই দেখেছেন, যাঁরাই শুনেছেন ধিক্কারে ফেটে পড়েছেন। পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর গণআন্দোলন দমনে রাজ্য সরকারের বর্বরতার বিরুদ্ধে জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়।

রঘুনাথপুরে রিক্সা ভ্যান শ্রমিকদের আন্দোলন

রিক্সা ভ্যান শ্রমিকদের পরিচয়- পত্র, তাদের বিপিএল তালিকাভুক্ত করা, সন্তানদের শিক্ষা অনুদান নিয়ে হয়রানি বন্ধ করা, প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করা সহ ১০ দফা দাবিতে ৩০ আগস্ট রঘুনাথপুর পৌরসভার শতাধিক রিক্সা ভ্যান শ্রমিক মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন। তিনি দাবিগুলি পূরণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। সাথে সাথে অন্ত্যোদয় কার্ড বিলি বণ্টনের আদেশ দেন।

এই বিক্ষোভ ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পুরুলিয়া জেলা কমিটির সদস্য কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা, রিক্সা ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে কমরেড অরুণ বাউরী, কমরেড শক্তি বাউরী।

চীনের গরিব মানুষের দুঃসহ অবস্থাই মাওয়ের হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছিল

একের পাতার পর

চীনের গরিব কৃষিজীবী মানুষদের উপর অমানুষিক শোষণ-নির্যাতন। মাও নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর বাবা ছিলেন ধনী চাষী, এবং সেই অর্থে তাঁর বাবাও ছিলেন অত্যাচারী। মাওয়ের জীবনের প্রথম বিদ্রোহ ছিল তাঁর বাবার বিরুদ্ধেই। পরবর্তীকালে তিনি দেখেছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত কৃষকের উপর সামন্তপ্রভুদের অবর্ণনীয় অত্যাচার, খাদ্য চাইতে এসে তারা পেয়েছে বুলেট। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কৃষকরা মাঝে মাঝেই বিদ্রোহে ফেটে পড়ত। সামন্তপ্রভুরা নির্মমভাবে সেগুলো দমন করত, বিদ্রোহের নেতাদের মুণ্ডচ্ছেদ করত। এসব জিনিস মাও নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। গরিব মানুষের এই দুঃসহ অবস্থা তাঁর হৃদয়ে আলোড়ন তুলেছে। এখান থেকেই তাঁর পথ খোঁজার সংগ্রামের শুরু। তিনি নিজেই বলেছেন, তাঁর বয়সী অন্যান্য ছেলেরা যখন সিনেমা, হৈ-হুল্লোড়ে, হাল্কা বিষয়ে মত্ত থাকত, মাও ও তাঁর বন্ধুদের আগ্রহ ছিল চীনের ও অন্যান্য দেশের ইতিহাস জানায়, দর্শন ও গভীর তত্ত্ব আলোচনায়।

ঐ সময় কুয়োমিনটাং দলের নেতৃত্বে চীনে জাতীয় বুর্জোয়া বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। অনেকটা আমাদের দেশের নেতাজী সুভাষ বসুর মতই ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ছিলেন একজন প্রখ্যাত জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা। তাঁর সংস্পর্শে আসেন মাও সে-তুঙ এবং আন্দোলনে যোগ দেন। কিছুকাল বাদে মার্কস-এঙ্গেলস-এর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বইটি তিনি পান, সেটাই মাওয়ের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দেয়, সাম্যবাদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ জন্মায়, তিনি পথ খুঁজে পান। অন্যদিকে সোভিয়েট বিপ্লবের বার্তাও চীনে এসেছে। তিনি কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে 'নিউ পিপলস্ স্টাডি সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের অধিকাংশ সদস্যই পরে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির গঠনে ভূমিকা নেন। কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবেন, সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তখনও আসেনি, কিন্তু লড়াইয়ের মনোভাব ছিলই। জানতেন, কঠিন কঠোর লড়াই করতে হবে। সেজন্য জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চা করেছেন গভীরভাবে। অত্যন্ত কষ্টকর অবস্থার মধ্যেও যাতে শরীর বাধা না হয়, সেজন্য বরফের উপর শুয়ে থেকেছেন, নদীর বরফ শীতল জলে সাঁতার কেটেছেন। আবার অত্যন্ত গরমের মধ্যে শরীরকে ফেলে মজবুত করেছেন। এসব ইতিহাস তিনি নিজেই বলেছেন। মাওয়ের কথায় "১৯২০ সালের মধ্যে আমি তত্ত্বগতভাবে ও কিছুটা প্রয়োগগত দিক থেকে মার্কসবাদী হয়ে উঠি।" এই সময় মার্কসবাদ অধ্যয়ন ও সোভিয়েট সমাজতন্ত্র সম্পর্কে চর্চাকে সামনে রেখে চীনে বহু স্টাডি গ্রুপ গড়ে ওঠে। মাও নিজেও অনেকগুলি গড়ে তোলেন।

১৯২১ সালে সাংহাইয়ে যাঁরা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেন, তাঁদের মধ্যে মাও ছিলেন অন্যতম। পার্টির প্রথম কংগ্রেস থেকেই প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেয়। একদল চীনের মাটিতে একটি পরিপূর্ণ সর্বহারাশ্রেণীর পার্টি বা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার বাস্তবতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে। অপর দল বলে, এখনই সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির এককভাবেই লড়াইয়ের ডাক দেওয়া দরকার, সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীনের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিন্টাংয়ের সাথে ঐক্যের প্রয়োজন নেই। এই উগ্র বামপন্থী চিন্তাধারার লাইন ভোটে জয়ী হলেও, মাও ঐ দুটি মতেরই বিরোধী ছিলেন। এরপর মাও হুনানে ফিরে গিয়ে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করেন। এজন্য শাসকদের রোষে পড়ে হুনান থেকে গোপনে তিনি সাংহাই চলে যান। ১৯২৩ সালে, তাঁরই উদ্যোগে, চীনের পার্টি সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনটাংয়ের কাছে ঐক্যের প্রস্তাব নেয়। লেনিন ও পরবর্তীকালে স্ট্যালিনের গাইডলাইন ছিল যে, ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে যেটা বিপ্লবী অংশ, অর্থাৎ যারা সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস নয়, লড়াই চায়, তাদের সাথে কমিউনিস্টদের ফ্রন্ট করতে হবে। এই শিক্ষার ভিত্তিতেই মাও সে-তুঙ সান ইয়াৎ সেনের কুয়োমিনটাংয়ের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের জরুরি প্রয়োজনের কথা বলেন। সান ইয়াৎ সেন ছিলেন যথার্থ দেশপ্রেমিক, সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন, তার নিজের দলের কর্মসূচিতেও তিনি ঐক্যবদ্ধ চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকে লক্ষ্য হিসাবে যুক্ত করেন। এটা আমাদের দেশে সুভাষ বসু'র মধ্যেও ছিল, কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের 'গাইডলাইন' উপলব্ধি করতেও ব্যর্থ হয়, সুভাষ বসুকে বুঝতেও ব্যর্থ হয় — যা ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথই সহজে করে দেয়। ১৯২৪ সালে স্বয়ং সান ইয়াৎ সেন কমিউনিস্টদের আহ্বান জানান, কমিউনিস্ট পার্টির পৃথক অস্তিত্ব ও কাজকর্ম অটুট রেখেই তারা যেন কুয়োমিনটাং দলে যোগ দেয়। মাও সে-তুঙ সেটাই করেন। তাঁর উপরই দায়িত্ব পড়ে দুই পার্টির মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলা ও তা রক্ষা করার। কারণ, তিনিই ছিলেন এই ফ্রন্টের সবচেয়ে বড় উদ্‌গাতা ও এক বিরাট মাপের সংগঠক। কিন্তু কুয়োমিনটাং একটা সুসংহত বুর্জোয়া দল ছিল না। তাছাড়া দলের মধ্যে সান ইয়াৎ সেনবিরোধী দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নানা গ্রুপ ও চক্র কাজ করত।

লেনিন-স্ট্যালিনের শিক্ষা থেকে মাও জানতেন যে, এ যুগে চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে, এমনকী সান ইয়াৎ সেনের স্বপ্নকে যদি সফল করতে হয়, তবে সেই বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে হবে শ্রমিকশ্রেণীকেই। কিন্তু চীনের মতো দেশে বাস্তবে এর রূপটি কী হবে, সংখ্যায় খুবই অল্প শ্রমিক ও অন্যদিকে বিশাল কৃষক অধ্যুষিত চীনে বিপ্লবী বাহিনীর মূল শক্তি কারা হবে — এটা চীনের কমিউনিস্টদেরই স্থির করতে হবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিচারধারা প্রয়োগ করে। মাও বললেন, চীনের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব হবে আদর্শগত, গরিব চাষীরাই হবে চীনের সর্বহারা বিপ্লবী বাহিনীর মূল শক্তি। গ্রামে গ্রামে ঘুরে চাষীদের সঙ্গে দিন কাটিয়ে, কথা বলে, তিনি তাদের সমস্যাকে কাছ থেকে বুঝলেন। তাঁর কথায়, "আমি কত কিছু শিখলাম, অনুভব করলাম আমার চেয়ে গরিব চাষী-মজুররা কত বেশি জানে।" এরপরই তিনি গরিব চাষীদের, যারা তখন চীনে মোট চাষীদের মধ্যে ৭০ শতাংশ, তাদের নিয়ে চাষী সংগঠন গড়ার কাজে নেমে পড়লেন। এদের মধ্য থেকেই পরবর্তীকালে চীনের মুক্তি সেনাবাহিনী রেড আর্মি গড়ে উঠেছিল। চীনের বিপ্লবে গরিব চাষীর ভূমিকা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে প্রবল বিতর্ক হয়, তদানীন্তন নেতৃত্বকে দিয়ে মাও তাঁর লাইন মানাতে পারেন নি। বস্তুত বহুদিন একই পার্টির মধ্যে দুটি সমান্তরাল চিন্তা চলেছে। একটা কখনও দক্ষিণপন্থী, কখনও উগ্র বামপন্থী চিন্তা, অপরটি চীনের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মাওয়ের সঠিক বিপ্লবী চিন্তা।

সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর কালক্রমে ষড়যন্ত্রী চিয়াং কাই শেক নানাভাবে ক্ষমতা করায়ত্ত করে নেয়। সে ছিল কুয়েমিনটাং সেনাদলের প্রধান। পরে সে-ই দলের নেতা হয়ে বসে। সান ইয়াৎ সেনের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী লাইনের বিপরীতে চিয়াং ছিল দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি, ব্রিটিশ জাপান সাম্রাজ্যবাদীদের ঘনিষ্ঠ মিত্র। কমিউনিস্টদের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য চিয়াং মরিয়া হয়ে ওঠে। কারণ গ্রামাঞ্চলে তখন মাওয়ের উদ্যোগে প্রবল চাষী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, সারা চীনে লক্ষ লক্ষ চাষী সংগঠন গড়ে উঠেছে। তারা স্থানীয় অত্যাচারী সামন্তী জমিদারদের আক্রমণ করছে, জমি কেড়ে নিচ্ছে। শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, রাস্তা তৈরি, নদীর পাড় বাঁধানো ইত্যাদি সব কাজও তারা করছে, অর্থাৎ গরিব চাষীরা জেগে উঠেছে। ১৯২৭ সালে চিয়াং সাংহাইতে কমিউনিস্ট পার্টির উপর সেনা লেলিয়ে দিল, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রমিক সংগঠনের শত শত সদস্যকে হত্যা করা হল, হাজার হাজার শ্রমিক বীভৎস অত্যাচারের সম্মুখীন হল। কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন নেতৃত্ব ভয় পেয়ে গেল, তারা বিপ্লবী বুলির আড়ালে কুয়েমিনটাঙের কাছে আত্মসমর্পণ করল, এবং চাষী আন্দোলনকে 'বাড়াবাড়ি' আখ্যা দিয়ে মাওয়ের নিন্দা করল। এর দ্বারা যখন চিয়াং-এর আক্রমণ কমল না, বরং বেড়ে গেল, প্রচুর কমিউনিস্ট নিহত হল, তখন অন্যান্যরা তৎকালীন পার্টি নেতৃত্বের ভয়ঙ্কর ভুল বুঝতে পারে এবং নেতার পদ থেকে চেন তু শিউকে সরে যেতে হয়। কিন্তু দক্ষিণপন্থী আপসের লাইন পরাস্ত হলেও, পরপরই আবার উগ্র বামপন্থী লাইন মাথা চাড়া দেয়। নতুন নেতৃত্ব বলে, আগে গ্রাম নয়, আগে 'শহর দখল করতে হবে।' মাও কিন্তু বরাবর বলেছেন, চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে বিপ্লবী অভ্যুত্থান গ্রাম থেকেই শুরু হবে। গ্রাম দিয়েই শহর ঘিরে ফেলতে হবে। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, চীনের বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট অসমতা রয়েছে, সামন্তী ওয়ারলর্ডদের অধীনস্ত প্রদেশগুলির নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘর্ষ, দুটি বা তার অধিক লাগোয়া প্রদেশগুলির সীমান্তে সর্বদা উত্তেজনা বিরাজ করছে। আবার এইসব ওয়ারলর্ডদের সাথে চিয়াং-এর যে ঐক্য ও জোট, তার মধ্যেও সর্বদা ভাঙন ও বিবাদ রয়েছে। অর্থাৎ চীনে কোনও কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই, কেন্দ্রীয় সেনাবাহিনী নেই। একেই তিনি বলেছেন শত্রুর দুর্বলতা, যার সুযোগ বিপ্লবীদের নিতে হবে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে স্বয়ং সম্পূর্ণ কৃষি অর্থনীতি, অর্থাৎ খাদ্যের জন্য, বা বেঁচে থাকার জন্য শহরের উপর নির্ভর করতে হবে না। এখানেই রাশিয়ার পরিস্থিতি বা অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের সাথে চীনের পার্থক্য। তাঁর কথায়, আধা সামন্তী, আধা ঔপনিবেশিক চীনের বিশেষ এই পরিস্থিতি যতদিন থাকবে, ততদিন চীনে শ্রমিক-চাষীর সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তাঞ্চলের অস্তিত্বও সম্ভব হবে, অবশ্যই যদি সঠিক নেতৃত্ব পায়। ১৯৩৮ সালে পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ প্লেনারি অধিবেশনের বক্তৃতায় মাও আরও বলেছেন, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আছে, আইনসম্মত আন্দোলন করার অধিকার আছে, সেখানে কমিউনিস্টদের তার সুযোগ নিয়ে আইনসম্মত আন্দোলনের পথেই শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে বিপ্লবের পথে এগোতে হবে। চীনে এই সুযোগ নেই। চীনে যদি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র থাকত, ট্রেড ইউনিয়ন করার, গণআন্দোলন করার, ধর্মঘট করার রাজনৈতিক অধিকার থাকত, তবে চীনের কমিউনিস্টরাও ধর্মঘট-আন্দোলনের পথেই গণসমর্থন ও গণভিত্তি গড়ে তুলে এগোত। চীনে এই পরিস্থিতি নেই বলেই মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করার পথে যেতে হচ্ছে। ভারতবর্ষে যাঁরা নকশালপন্থী তথা 'মাওবাদী' বলে পরিচিত, যাঁরা চীনের অনুকরণে ভারতবর্ষে বিপ্লবের কথা বলেন, মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির কথা বলেন, তাদের মাওয়ের এই শিক্ষাটিকে বুঝতে হবে। কারণ কেন্দ্রীভূত পুঁজিবাদী শাসন ও পার্লামেন্টারি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে ভারতবর্ষ, আর সেই সময়কার চীন এক নয়। মাও যে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির কথা বলেছেন, সেটা আমাদের এখানে বারো ভুইঞাদের আমলে অনেকটা ছিল বলা যায়, এখন তা কোথায়?

১৯২৭ সালে চীনের গ্রামাঞ্চলে জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিরাট চাষী অভ্যুত্থান হয়। জমিদারদের নিজস্ব সেনাদল ও গুণ্ডাবাহিনী নানাস্থানে নির্মমভাবে ঐ অভ্যুত্থান দমন করতে পারলেও, হুনানে মাওয়ের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান জয়ী হয়। কারণ মাও সে-তুঙ ঐ অভ্যুত্থানের আগে হতদরিদ্র অর্ধাহারী চাষীদের মধ্য থেকেই সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন, যারা মোকাবিলা করেছিল সামন্তী ওয়ারলর্ডদের সেনার। এখান থেকেই শুরু হয় গরিব চাষীদের নিয়ে রেড আর্মি গঠন করা। মাও বলছেন, এটাই ছিল 'ক্ষমতা দখলের জন্য দীর্ঘ প্রকাশ্য লড়াইয়ের সূচনা।' এরপর চাষীদের এই মুক্তিবাহিনী একটার পর একটা প্রদেশ মুক্ত করতে করতে এগিয়ে যায়, যেগুলি লালঘাঁটি নামে পরিচিত হয়। মাও চিংকাংশান পাহাড়ে তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। প্রতিটি মুক্ত অঞ্চলেই মাও সর্বপ্রথম কমিউনিস্ট পার্টির শাখা প্রতিষ্ঠা করেন, পাশাপাশি চাষীদের নিজস্ব সংগ্রামী কমিটি বা পরিষদ গঠন করার উপর গুরুত্ব দেন।

এই মহান নেতা প্রবল কষ্টকর জীবনযাপনের মধ্যেও, প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের দিনেও বিপ্লবের আদর্শগত দিক, রণনীতি-রণকৌশলগত লাইন নিয়ে নানা মৌলিক রচনা লিখেছেন। এইরকম একটি নিবন্ধেই লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি দেখান যে, চীন এখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই আছে, তবে সেটা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া সম্পূর্ণতা পাবে না। সান ইয়াৎ সেনের স্বপ্ন ও লক্ষ্যকে চিয়াং ধ্বংস করেছে ঠিকই, কিন্তু কুওমিনটাঙের সকলেই চিয়াংয়ের সাথী নয়। সুতরাং, কেন্দ্রীয় কমিটির যে উগ্র বামপন্থী লাইন কুওমিনটাঙের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা বলেছিল, মাও তার সমালোচনা করে বলেন — এটা ভুল, এই লাইন পার্টি ও রেড আর্মিকে ব্যাপক জনগণ থেকে, এক বিরাট সংখ্যক সম্ভাব্য মিত্র পেটিবুর্জোয়াদের থেকে ও জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশটা লড়তে চায়, তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। তিনি ব্যাপক জনগণকে ও

১৯৩৮ সালে পার্টির ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির ষষ্ঠ প্লেনারি অধিবেশনের বক্তৃতায় মাও আরও বলেছেন, পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র আছে, আইনসম্মত আন্দোলন করার অধিকার আছে, সেখানে কমিউনিস্টদের তার সুযোগ নিয়ে আইনসম্মত আন্দোলনের পথেই শ্রমিকশ্রেণীকে শিক্ষিত করে বিপ্লবের পথে এগোতে হবে। ... চীনে এই পরিস্থিতি নেই বলেই মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি করার পথে যেতে হচ্ছে।

চারের পাতায় দেখুন

মাও দেখিয়েছেন, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য মানে অন্ধতা নয়

তিনের পাতার পর

কুওমিনটাঙের মধ্যেকার দেশপ্রেমিক শক্তিদের দেখাতে চাইলেন যে, সামন্তী ও সাম্রাজ্যবাদী দখল থেকে দেশের মানুষকে মুক্ত করার জন্য যারা সত্যিই লড়াই চাইবে, তাদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা ঐক্য চায়। তিনি পার্টির নেতা -কর্মীদের বললেন, গণভিত্তির উপর পার্টি সংগঠন গড়ে তোলাই রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে মূল কথা। চিংকাংশানে পার্টির নেতৃত্বে রেড আর্মি এই কাজটাই করছিল। এইসময় লি লি সান-এর উগ্র বামপন্থী লাইন বলল, গ্রামের ঘাঁটিগুলির থেকে শহরে আক্রমণ চালাতে। মাও বললেন, এখন শহরে আক্রমণ চালতে গেলে রেড আর্মি ধ্বংস হয়ে যাবে। মাওয়ের কথা না শুনে কিছু নেতা ও সেনাকমাণ্ডার চাংশায় আক্রমণ করতেই পাল্টা ভয়াবহ আক্রমণ নেমে এল। শ্রমিক, ছাত্র ও যাদেরই কমিউনিজমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বলে মনে করা হল, তাদেরই হত্যা করা হল। এখানেই মাওয়ের স্ত্রী ইয়াং কাই হুই গোপন ডেরা থেকে ধৃত ও নিহত হন। মাও সেদিন যেভাবে ধীরে ধীরে বিপ্লবী ঘাঁটি গড়ে তুলে ক্ষমতা দখলের দিকে এগোচ্ছিলেন, সেটা পার্টির অনেকের পছন্দ হয়নি, তারা অধৈর্য হয়ে চটজলদি বিপ্লব সেরে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু মাওকে টলানো যায়নি।

১৯৩০-৩১ সালে চিয়াং কাইশেক, ব্রিটিশ, জাপান ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় কমিউনিস্ট খতম অভিযানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রেড আর্মি গেরিলা যুদ্ধে কুওমিনটাঙ বাহিনীকে নাস্তানাবুদ করে দিল। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কুওমিনটাঙ সেনাদের মধ্যেও আলোড়ন তুলল, হাজারে হাজারে তারা কমিউনিস্টদের সাথে যোগ দিল। এইভাবে চিয়াং কাইশেক যখন কমিউনিস্টদের খতম করার জন্য সামরিক অভিযান চালাচ্ছে, সেসময় ১৯৩১ সালে জাপান আক্রমণ করল চীনকে। মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিল। মাও বললেন, জাপ আক্রমণের ফলে চীনের সমাজে শ্রেণীসম্পর্ক, শ্রেণী- দ্বন্দ্বের চরিত্র পাল্টে গেল, এখন চীনের সমগ্র দেশপ্রেমিক জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্বই প্রধান। সুতরাং, চিয়াং-এর বিরুদ্ধে নয়, চিয়াং-এর সাথে ফ্রন্ট করেই কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। পার্টির মধ্যে যারা এর তাৎপর্য ধরতে পারেনি, মাও তাদের বোঝালেন। কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াংকে প্রস্তাব দিল ঐক্য করার। কিন্তু চিয়াং তাতে রাজি হল না। তার কাছে কমিউনিস্টরাই মূল শত্রু, সাম্রাজ্যবাদ বরং মিত্র। ফলে চিয়াং কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ বাড়িয়ে দিল। গ্রামের লাল ঘাঁটিগুলির উপর প্রবল সামরিক হানাদারি নেমে এল। আকাশ পথে সাম্রাজ্যবাদীদের বিমান হানা, স্থলে চিয়াং-এর সেনা আক্রমণ। লাল ঘাঁটিগুলি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। রেড আর্মির খাদ্যসরবরাহ বিপর্যস্ত, তার উপর দিনে রাতে যুদ্ধ, বিশ্রাম নেই, লাল সেনারা ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। কমিউনিস্টদের মূল ঘাঁটি এলাকা ক্রমেই কমতে থাকল। চিয়াং-এর সেনারা পুরো ঘাঁটি দখল করার জায়গায় চলে এল। লালফৌজ ও কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব বিপন্ন হল। এসময়ই পার্টি মাওয়ের প্রস্তাব অনুযায়ী মজুত লালসেনাদের নিয়ে শত্রুর অবরোধ ভেঙে সুদূর উত্তর চীনে শেনসি প্রদেশের কিছুটা নিরাপদ অঞ্চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটাই ইতিহাসে 'লং মার্চ' নামে খ্যাত হয়ে আছে। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে মানুষের ইতিহাসে কেউ দেখেনি। বিমান থেকে বোমা পড়ছে, সামনে-পিছনে, চারদিকে শত্রুসেনার কামান-বন্দুকের আক্রমণ, তার মধ্যে হাজার হাজার লাল সেনা পায়ে হেঁটে ৮০০০ মাইল পথ অতিক্রম করেছে। অসুস্থতা ছাড়া বাকী অধিকাংশ সময় মাও সে-তুঙ হেঁটেছেন, নিজের ওভারকোটটি শীতে কাতর কমরেডকে দিয়েছেন। ১৯৩৪ সালের অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে এই আত্মরক্ষার অভিযান শেষ হয়েছিল ১৯৩৫ সালের অক্টোবর নাগাদ। দীর্ঘপথে মাও সে-তুঙ ও লালসেনারা পায়ে হেঁটে ১৮টি পর্বতমালা, ২৪টি খরস্রোতা নদী পার হয়েছিল, ১১টি প্রদেশ অতিক্রম করার পথে চিয়াং বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তারা ৬৪টি শহর পার্টির দখলে এনেছিল, চিয়াং-এর ১০ লক্ষাধিক সেনাকে পরাস্ত করেছিল। এই লংমার্চের মধ্যেই ১৯৩৫ সালে পার্টির একটি বিশেষ অধিবেশনে মাও সে-তুঙ চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। চীনের পার্টির ১৪ বছরের সংগ্রামী ইতিহাসে একথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, রণনীতি ও রণকৌশলে মাও সে-তুঙের চিন্তাই সঠিক, একমাত্র তিনিই মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে চীনের মাটিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা মনে করি, ১৯৩৫ সালে মাও সে-তুঙের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই একমাত্র চীনের পার্টি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টির চরিত্র অর্জন করেছিল। প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত পার্টিকে মাও সে-তুঙই সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে যথার্থ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারায় পুনর্গঠন করেছিলেন তাই নয়, বস্তুত, মাওয়ের নেতৃত্বে সেদিন কার্যত একটা নতুন পার্টিই জন্ম নিয়েছিল।

লংমার্চের পর মুক্তাঞ্চলের প্রধান ঘাঁটি ইয়েনান থেকে মাও সে-তুঙ আবার জাপবিরোধী যুক্তফ্রন্ট গড়ার জন্য চিয়াং-এর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি চীনের ব্যাপক জনগণের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে, লং মার্চ ও জাপবিরোধী যুদ্ধে পার্টির বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা জনগণের মধ্যে সমর্থন বাড়িয়েছে। চিয়াং-এর প্রতি প্রস্তাবে মাও বললেন, কুওনিটাং যদি সান ইয়াৎ সেন-এর তিনটি নীতি — জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মেনে চলে, সোভিয়েট রাশিয়ার সাথে মৈত্রী করে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সহায়তা করে এবং শ্রমিক-চাষীদের স্বার্থ দেখে, তাহলে কমিউনিস্ট পার্টি কুওমিটাঙকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানাবে — সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও সামন্তী অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুক্তফ্রন্ট গড়ে তুলবে। চিয়াং এই প্রস্তাবে রাজি হল না। সে বুঝল যে, এই যুক্তফ্রন্টে রেড আর্মি অটুট থাকবে এবং ফ্রন্টের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির হাতেই থাকবে। সে দাবি করল, রেড আর্মি রাখা চলবে না, তাকে কুওমিটাং বাহিনীর সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। আসলে, সেনাশক্তির উপরই যে শেষপর্যন্ত ক্ষমতা দখল নির্ভর করে, সেটা চিয়াং জানত।

মাওয়ের এই দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্টের লাইনকে কেন্দ্র করে পার্টির মধ্যে প্রথম বিরুদ্ধতা আসে এই বলে যে, ইয়েনানকে ভিত্তি করে বিরাট অঞ্চলব্যাপী কমিউনিস্ট পার্টি যখন আলাদা প্রশাসন, বিরাট সেনাদল গঠনের মধ্য দিয়ে কার্যত একটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে, এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির গৌরবময় ভূমিকা যখন পার্টিকে জনপ্রিয় করেছে, তখন কেন চিয়াং-এর সাথে ঐক্য করা হবে? মাও বললেন, চীন এখনও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরেই আছে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে নয়। আমরা গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে এখন চলছি। সাম্রাজ্যবাদী ও সামন্তপ্রভু ছাড়া অন্যদের জমি অধিগ্রহণের দাবি আমরা তুলছি না, যা একটা বিরাট অংশের বুর্জোয়াদের আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে টেনে আনতে সাহায্য করবে। আমরা এখন যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই, সেখানে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য আইন থাকবে ঠিকই, কিন্তু পুঁজিপতিরা সেখানে মুনাফা করতে পারবে, ব্যক্তি মালিকানায় শিল্পও চালাতে পারবে। সমাজতান্ত্রিক মালিকানায় রূপান্তর ঘটবে পরবর্তীকালে। অর্থাৎ চীনের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী বিপ্লবে তখন জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে মৈত্রী চাই। একেই মাও বলেছেন, 'নয়া গণতন্ত্র'। জাপবিরোধী যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির ঐক্যের আহ্বান ব্যাপক দেশপ্রেমিক জনগণকে ও জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আস্থা-বিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে বলেই মাও যুক্তফ্রন্টের আহ্বান জানান। ভারতবর্ষে যারা "চীনের পথ আমাদের পথ" বলে মনে করেন, তাঁরা আবার মিলিয়ে দেখুন, কোনও দিক থেকেই আজকের পুঁজিবাদী ভারতবর্ষের সাথে তদানীন্তন চীনের পরিস্থিতির মিল পাওয়া যায় কি?

আবার কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান সম্পূর্ণ অটুট রেখে, রেড আর্মিকে বহাল রেখে মাও যেভাবে চিয়াং-এর সাথে ঐক্য চাইলেন, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্ব 'কমিনটার্ন' তার তাৎপর্য ধরতে পারেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরে মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত কমিনটার্ন চীনের পার্টিকে বলেছিল, এখন চিয়াংকে জার্মান-জাপান শিবির থেকে দূরে রাখা দরকার, চিয়াং যদি অক্ষশক্তির শিবিরে যোগ দেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে চীনের পার্টি সফল হতে পারবেনা, অতএব, চিয়াং-এর সব শর্ত মেনে, এমনকী রেড আর্মি ভেঙে দিয়েও চীনের পার্টির উচিত চিয়াং-এর সাথে সর্বাত্মক ঐক্য করা। স্ট্যালিনকে নেতা ও শিক্ষক মেনেও মাও সে-তুঙ ঐ নির্দেশ গ্রহণ করতে পারলেন না। চিয়াং-এর বহু দাবি মেনে নিলেও রেড আর্মির পৃথক অস্তিত্ব রক্ষায় অনড় থাকলেন। তিনি বললেন, চীনের বিশেষ পরিস্থিতি স্ট্যালিন বুঝতে পারেন নি। এর মধ্য দিয়ে মাও সে-তুঙ দেখালেন, কীভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞানকে একটা দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করতে হয়। তিনি এটাও প্রমাণ করলেন যে, আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য মানে অন্ধতা নয়। অন্যদিকে স্ট্যালিনও এক বিরাট মাপের সৃজনশীল মার্কসবাদী নেতা। চীন বিপ্লব সফল হওয়ার পর মাও সে-তুঙ প্রথমবার রাশিয়ায় গেলে স্ট্যালিন বলেছিলেন, আপনিই ঠিক কাজ করেছেন, একটা বড় ভুলের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার পার্টিকেও তিনি বলেছিলেন, চীনের পার্টি আমার কথা না মেনেই ঠিক করেছে। স্ট্যালিন এই ধরনের নেতৃত্বেই বিশ্বাস করতেন।

যুক্তফ্রন্টের জন্য মাওয়ের আবেদনে চিয়াং রাজি না হওয়ায়, শেষপর্যন্ত কুয়োমিনটাঙ সেনা দলে বিদ্রোহ হয়, চিয়াং একটি অঞ্চল সফরে গেলে তার দলের সেনারাই তাকে বন্দী করে ফেলে। মাওয়ের নির্দেশে চৌ এন লাই যান কথা বলে চুক্তি করতে। তারপরও চিয়াং চুক্তি মানেনি, রেড আর্মি ভেঙে দেওয়ার দাবি তুলেছে। মাও সে-তুঙ সবগুলি নয়, কিছু আর্মি ইউনিট ভেঙে দিলেন। কমিউনিস্টরা যে যথার্থ দেশপ্রেমিক এসত্য চীনের জনগণের সামনে আরও পরিষ্কার হল, এবং চিয়াং আরও বিচ্ছিন্ন ও কোণঠাসা হয়ে গেল। ঐক্যের মধ্যেও চিয়াং সুযোগ পেলেই কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তবুও মাও ঐক্য ভাঙেন নি। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টি। সকল পর্যায়েই কাজ করেছে মাওয়ের সৃজনশীল, অভিজ্ঞ নেতৃত্ব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শেষ, চিয়াংকে আহ্বান জানিয়ে মাও বললেন, এখন কুওমিনটাং ও কমিউনিস্ট পার্টি মিলে কোয়ালিশন সরকার করতে পারি। গণতান্ত্রিক সংবিধান হোক, ভূমিসংস্কার হোক, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হোক। জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির এই প্রস্তাব সমর্থন করলেও চিয়াং মানল না, উল্টে আক্রমণ করল কমিউনিস্টদের।

এবার মাও সে-তুঙ দেশবাসীকে বললেন, আমরা ঐক্যের জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, এখন আমাদের আত্মরক্ষার জন্য লড়তে হবে। জনগণ মাওয়ের সমর্থনে দাঁড়াল। আত্মরক্ষার লড়াই শেষ পর্যন্ত '৪৯ সালে সফল বিপ্লবে পরিণত হল।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আগাগোড়া আন্ডারগ্রাউন্ডে, জঙ্গলে-পাহাড়ে থেকে এই মহান নেতা যখন লড়াই করেছেন, তখনও দর্শন ও তত্ত্বচর্চায় তাঁর বিরাম ছিল না। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, যেদেশে যাঁরাই হাতে-কলমে যথার্থ বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলবেন, তাঁদেরই সেই দেশের পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদকে বিশেষীকৃত বা 'কংক্রিটাইজ' করতে হবে, এবং তা করতে গিয়েই তাঁরা মার্কসবাদের জ্ঞানভাণ্ডারে সৃজনশীল অবদান রাখবেন। মাও যেটাকে বলেছেন 'ইন্ট্রিগেশন', কমরেড ঘোষ তাকেই বলেছেন 'কংক্রিটাইজেশন'। লেনিনের শিক্ষা থেকে আমরা এটা পেয়েছি। লেনিন বলেছিলেন, মার্কস ও এঙ্গেল্‌স মার্কসবাদী বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছেন, বিপ্লবের সাধারণ গাইডলাইন দিয়ে গিয়েছেন, এখনকার মার্কসবাদীদের দায়িত্ব হচ্ছে, নতুন সমস্যা, নতুন পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে বিকশিত করা, ভিন্ন ভিন্ন দেশ অনুযায়ী তার বিশেষ প্রয়োগ ঘটানো। লেনিন স্বয়ং একাজটি করেছিলেন শুধু নয়, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে সর্বহারা বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য, রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মৌলিক অবদান রেখেছেন, যেজন্য আমরা বলি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। চীনের মাটিতে মাও সে-তুঙকে আমরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগ ঘটাতে দেখেছি। আমাদের দেশেও কমরেড শিবদাস ঘোষ, বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্ক্সবাদের বিশেষ প্রয়োগের উপরই বারবার জোর দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের ক্ষেত্রেও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বদা সংগ্রাম করেছেন। আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেও, নেতৃত্বের ভুল ও সীমাবদ্ধতা দেখাতে তিনি কখনও দ্বিধা করেননি, আমাদেরও সেই শিক্ষাই দিয়েছেন।

ঔপনিবেশিক দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রমকে প্রথম চীনের মাটিতে রূপ দিতে গিয়ে মাও সে-তুঙকে বারবার পার্টির মধ্যে আদর্শগত ও প্রয়োগগত বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। এই লড়াই থেকেই দুটি অসামান্য রচনা আমরা পেয়েছি। একটি হচ্ছে 'অন প্র্যাকটিস', অর্থাৎ প্রয়োগ প্রসঙ্গে ; অপরটি 'অন কনট্রাডিকশন' — দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে। যারা শুধু বইয়ের মধ্যে বাঁধা আছে, বাস্তব পরিস্থিতিকে বইয়ের কোটেশন দিয়ে ব্যাখ্যা করছে, তারা হচ্ছে 'ডগমাটিস্ট' , গোঁড়া। অপর দিকে যারা মাঠে-ময়দানে কাজ করছে, তত্ত্বচর্চা করছে না, কেবল উপর উপর যা চোখে দেখছে, তা থেকে ভাসাভাসা আংশিক ধারণাকেই সাধারণ সত্য মনে করে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, তারা হচ্ছে 'ইমপিরিসিস্ট' — অভিজ্ঞতাবাদী। 'অন প্র্যাকটিস' আলোচনায় মাও এই দুটি ঝোঁকের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেছেন। জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের সমৃদ্ধ আলোচনাও আমরা পেয়েছি। 'অন কনট্রাডিকশন' রচনায় মাও দ্বন্দ্বতত্ত্ব বোঝালেন। তিনি দেখালেন, এক এক দেশের পরিস্থিতি এক এক রকম। একটি পরিস্থিতির থেকে আর একটি পরিস্থিতির পার্থক্য হচ্ছে তার বিশেষ অবস্থানগত পার্থক্য। দ্বন্দ্বের সাধারণ নিয়ম সর্বত্রই কাজ করছে, কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই সে ক্রিয়াশীল। যেমন ধরুন, আমেরিকায় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র নিয়েছে, রাষ্ট্রচরিত্রও তাই। সেখানে যারা কৃষিশ্রমিক, তারা হাজার হাজার বিঘা জমির ফার্মে চাষ করে। আবার ভারতেও পুঁজিবাদ, এমনকী ভারতীয় পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী বৈশিষ্ট্যও অর্জন করেছে, কিন্তু ভারতের পুঁজিবাদী কৃষি অর্থনীতির চেহারাটা আমেরিকা-ইউরোপের মতো নয়, সেখানে পার্থক্য আছে। সাধারণ দ্বন্দ্বের মধ্যেও বহু দিক থাকে। যেমন,ভারতবর্ষে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধেই আমাদের মূল লড়াই, কিন্তু এই পুঁজিবাদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

একটা বিধ্বংসী ঝড় আমেরিকার ভিতরের চেহারা নগ্ন করে দিল

প্রবল ঝড়-বন্যায় ডুবে গেল বিস্তীর্ণ এলাকা। তিনদিন আগে পূর্বাভাস থাকলেও এলাকার কয়েক লক্ষ মানুষকে কিন্তু উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যাদের গাড়ি ছিল, টাকা ছিল — তেমন কিছু মানুষ পালাতে পেরেছে, কিন্তু বাকিরা সবাই প্রকৃতির ভয়াল তাণ্ডবের শিকার। হাজার হাজার মানুষ মরছে, তাদের পচা ফুলেওঠা লাশ ভেসে যাচ্ছে, কোথাওবা উঁচু জায়গা পেয়ে স্তূপীকৃত হচ্ছে। যারা বেঁচে আছে, তাদের জন্য খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, ওষুধ নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। সরকার বা প্রশাসনের সাহায্য বলতে কিছু নেই। তারই মাঝে যার যা সম্বল ছিল লুঠ হয়ে যাচ্ছে, মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ঘুরছে পুলিশ ও সেনা, যাকে খুশি গুলি করছে।

বলতে পারেন এমন অরাজক, বর্বর পরিস্থিতি কোথায়? সেটা কোন্ দেশ? মনে হতে পারে, প্রত্যন্ত আফ্রিকা কিংবা এশিয়ার কোনও হতদরিদ্র দেশ। না, তা নয়। দেশে দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য যে দেশের শাসকরা কাতর, এ সেই দেশ — সর্বোন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিকতার অহঙ্কারে দর্পিত আমেরিকা। আমেরিকার দক্ষিণ উপকূলে প্রলয়ঙ্করী 'ক্যাটরিনা' ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত বন্দরশহর নিউ অর্লিয়েন্স ও তার সংলগ্ন লুইজিয়ানা, মিসিসিপি, আলাবামা'র বিস্তীর্ণ এলাকার সাধারণ মানুষের অবস্থা এখন এমনই।

লোকে বলে — 'ধনী আমেরিকা।' মনে করে, 'আমেরিকার মানুষ কী ভাগ্যবান! ওখানে সবাই ধনী।' একটা ঘূর্ণিঝড় দেখিয়ে দিল সেই ধারণা কত ভুল, কত মিথ্যায় ভরা। আসলে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধনী শিল্পপতি-ব্যবসাদারেরা এখানে বাস করে। আমেরিকাসহ দেশে দেশে গরিব-মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে লুঠ করেই ওরা ধনী। ওরা আমেরিকার কোটি কোটি মানুষকে গৃহহীন করেছে, কেড়ে নিয়েছে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় তারা রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাতে রাত কাটায়। ঐ ধনীদের কল্যাণে আমেরিকার প্রায় চারকোটি মানুষ নেমে গেছে দারিদ্র্যসীমার নিচে; আমেরিকায় নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দারিদ্র্য, লঙ্গরখানায় ক্ষুধার্ত মানুষের লাইন ক্রমাগত দীর্ঘতর হচ্ছে ; চিকিৎসা চলে গেছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। জ্যাজ সঙ্গীতের সৃজনভূমি বন্দরশহর নিউ অর্লিয়েন্স-এর অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র; তাদের এক-তৃতীয়াংশ দারিদ্র্যসীমারও নীচে। তদুপরি এখানকার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ কৃষ্ণাঙ্গ — কালো চামড়ার মানুষ; ফলে বঞ্চনা আরও তীব্র। বাদবাকি এক-তৃতীয়াংশ সাদা চামড়ার মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় কিছু ধনী হলেও অধিকাংশই দরিদ্র — সাধারণ। দরিদ্র কৃষ্ণাঙ্গদের মত এরাও সরকারি অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার। প্রাকৃতিক ভয়াবহ বিপর্যয়েও সরকার, প্রশাসন এদের কারও পাশে দাঁড়ায় না।

তিনদিন আগে পূর্বাভাস মেলে যে, ভয়াবহ 'ক্যাটরিনা' আছড়ে পড়তে চলেছে। মার্কিন সরকার ঘোষণা করে — এলাকা ছেড়ে পালাও। ব্যস, দায়িত্ব শেষ। মানুষগুলো কোথায় যাবে, কী খাবে, — তার কোনও ব্যবস্থা সরকার করেনি। যাদের গাড়ি ছিল, অবস্থাপন্ন সেইসব শ্বেতাঙ্গ পরিবার বাইরে চলে যেতে পেরেছে। কিন্তু বাদবাকি সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ গরিব সাধারণ মানুষ যেতে পারেনি; কোথাও যাওয়ার মত উপায় তাদের ছিল না। সরকার ইচ্ছে করলে, বাস-ট্রাক-হেলিকপ্টার-প্লেন — কত উপায়েই না তিনদিনের মধ্যে সমস্ত মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু করেনি; বরং পরিকল্পিতভাবেই কয়েক লক্ষ মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্য ফেলে রাখল। অথচ মানুষগুলো কী সরল বিশ্বাসেই না বুক বেঁধেছে — সরকার এসে তাদের কোনও নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চয়ই সরিয়ে নিয়ে যাবে!

হাজার হাজার দেশবাসীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও কেন এই সরকারি নিষ্ক্রিয়তা? কারণ, সব দেশের একচেটিয়া পুঁজির সেবাদাস সরকারগুলির মত মার্কিন সরকারও বলে দিয়েছে — টাকা নেই। ঝড় ও বন্যাপ্রবণ এলাকাগুলি রক্ষার তহবিলের ৯১.৫ শতাংশ অর্থ ছেঁটে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেটুকু বরাদ্দ করা হয়েছে, তারও চারভাগের মাত্র এক ভাগ বাস্তবে দেওয়া হয়েছে। নদী ও সমুদ্রের বাঁধগুলি মজবুত করার জন্য অন্যান্য বছর যে অর্থ বরাদ্দ করা হত — এবছর সেই বরাদ্দও পুরোপুরি বন্ধ। আর বিপর্যয়ের পর বিধ্বস্ত শহর আবার নতুন করে গড়ে তোলার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগীয় বরাদ্দ ৪৪ শতাংশ ছেঁটে ফেলা হয়েছে। কিন্তু কেন? কারণ, যাবতীয় অর্থ গেছে ইরাকে 'গণতন্ত্র কায়েমে'র নামে মার্কিন দখলদারি মজবুত করতে। আমেরিকার জনগণের ট্যাক্সের টাকা ব্যয়িত হচ্ছে ইরাকের স্বাধীনতাযোদ্ধাদের হত্যার কাজে। এরাই বিশ্বজুড়ে সভ্যতার গর্ব করে বেড়ায়, গণতন্ত্র রক্ষার জয়ঢাক পেটায় ! এই হল ধনী আমেরিকা। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের এই হল উলঙ্গ চেহারা। এদের স্বরূপ দেখেই ঘৃণায় রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "সভ্যের বর্বর লোভ/নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।" গণতন্ত্র, ভোটাধিকার, পার্লামেন্ট ইত্যাদি পোষাকী নাম আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তার রক্ষকদের পাশবিক রূপটিকে আড়াল করার জন্যই।

৩১ আগস্ট লুইজিয়ানা, নিউ অর্লিয়েন্স, মিসিসিপি, আলাবামা-র উপকূল অঞ্চলে আছড়ে পড়ে ক্যাটরিনা। নদীর বাঁধগুলো ভেঙে ছুটে আসে প্লাবন। শহর সহ বিস্তীর্ণ এলাকা চলে যায় জলের তলায়, কোথাও বা ২০ ফুট পর্যন্ত উঁচু জল। নিউ অর্লিয়েন্সের ৮০ ভাগ এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। চতুর্দিকে মৃত্যু আর ধ্বংস। লাশের পর লাশ ভেসে যাচ্ছে, সহায়-সম্পদ ভেসে যাচ্ছে। বিভিন্ন উঁচু বাড়ির ছাদে, গাছে কিছু মানুষ আশ্রয় নিয়েছে। একটা স্টেডিয়াম খুলে দেওয়া হয়, সেখানে হাজার হাজার মানুষের গাদাগাদি ভিড়। স্টেডিয়ামের ভিতরে ও বাইরে মানুষ দলে দলে মরছে। ফুলে ফেঁপে ওঠা হাজার হাজার লাশ জলে ভাসছে। শুধু লুইজিয়ানাতেই মৃতের সংখ্যা দশ হাজার অতিক্রান্ত। মার্কিন প্রশাসন মৃতদেহ বহনের জন্য ইতিমধ্যেই ২৫ হাজার বডিব্যাগ ব্যবহার করেছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। কোনও উঁচু জায়গায় মানুষ সহায়-সম্পদ আঁকড়ে বাঁচার চেষ্টা করছে তো লুঠেরার দল হানা দিয়ে সব লুঠ করে নিচ্ছে। এরই মাঝে স্টেডিয়াম সহ যেখানে সেখানে মহিলা ও কিশোরীদের উপর বলাৎকার চালিয়েছে একদল পশু। আঠারো বছরের স্টিভ বাঙ্কারের নিখুঁত বর্ণনা — "এই তো ঠিক এখানেই কাল দু'টো খুন হয়েছে আমার চোখের সামনে। এক তরুণীকে জলের মধ্যে নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে দুষ্কৃতীরা। চিৎকারে ছুটে আসা তার স্বামীকে ওরা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয় ধারালো ছুরি দিয়ে। তারপর অবিকল একভাবে মেয়েটাকেও ফালফালা করে ফেলল ওরা।"

অনাহারী মানুষ খাদ্যের সন্ধানে কার্যত পশুর মতই হন্যে হয়ে ঘুরছে। মায়ের কোল থেকে হারিয়ে গেছে শিশু। শোকে উন্মত্ত স্বামী রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে স্ত্রীর সন্ধানে। সাহায্যের আশায় বসে থাকতে থাকতে চেয়ারে কাত হয়ে পড়ে থাকা অনাহারী বৃদ্ধের মৃতদেহ জানিয়ে দেয় — ক্যাটরিনার আঘাতে নয়, এমন সহস্র সহস্র মানুষের জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল স্রেফ সরকারি নিষ্ক্রিয়তায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কেবল ক্ষুধা, মৃত্যু, লুঠ আর ধর্ষণের রাজত্ব। এই হল একবিংশ শতাব্দীর আমেরিকা। মাঝে মাঝে সরকারিভাবে সামান্য কিছু ত্রাণসামগ্রী এলেও তা বেছে বেছে কেবল শ্বেতাঙ্গ মানুষজনকেই দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দুই -তৃতীয়াংশ যে কৃষ্ণাঙ্গ জনগণ — তারা ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। পেটের জ্বালায় ত্রাণসামগ্রী দেখতে পেলেই তারা কেড়ে নিচ্ছে, বয়স্ক ও শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে সেই খাদ্যে ক্ষুধা মেটাচ্ছে। বেঁচে থাকবার এই মরিয়া প্রচেষ্টায় রত মানুষদের পুলিশ, প্রশাসন ও তাদের প্রচারমাধ্যম 'বিপজ্জনক সশস্ত্র লুঠেরা দল' হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং 'গুলি করে হত্যা কর' হুংকারে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সাংবাদিক মাইকেল প্যারেন্টি লিখেছেন ঃ নিউ অর্লিয়েন্সে মার্কিন পুলিশ ও সেনা-অভিযানের মূল স্লোগান — "এই বেজন্মাদের গুলি করে হত্যা কর। যারা খাদ্য ও পানীয় নিয়ে শিশু ও বৃদ্ধদের সঙ্গে নিজেরা ভাগ করে খাচ্ছে — ওদের গুলি কর। যেসব অসুস্থ মানুষ বেঁচে ওঠার বাসনায় ওষুধ চাইতে ছুটে আসছে — ওদের গুলি কর। কিন্তু খবরদার, ওদের যা দরকার — সেগুলো ওদের দিও না। খালি গুদাম রক্ষা কর, খালি হোটেলগুলো রক্ষা কর। বেঁচে থাকা মানুষগুলোর কে পরোয়া করে! ওদের একটা বড় অংশ শীঘ্রই মারা পড়বে, আর বাদবাকীরা নীরব হয়ে যাবে।" কী নির্মম, নিষ্ঠুর মার্কিন প্রশাসন!

প্রথম দিকে যতটুকু উদ্ধারকার্য হয়েছে, তা করেছে স্বেচ্ছাসেবকরাই। নিউ অর্লিয়েন্স শহরের পাশেই আলজিয়ার্স; এই অংশটি প্লাবিত হয়নি। সেখানকার পার্কে ও স্কুলে সহজেই ৪০ হাজার মানুষের থাকার ব্যবস্থা করা যায়; সেখানকার মানুষও বিপন্নদের রক্ষায় প্রস্তুত। কিন্তু আইনের রক্ষকরা তাদের সেই অনুমতি দেয়নি। বিপন্ন মানুষদের উদ্ধারে ইচ্ছুক এই মানুষগুলোকে স্রেফ বাধাটুকু না দিলেই হাজার হাজার মানুষ বেঁচে যেত; ওরা বাঁচতে দেয়নি। ঠাণ্ডা মাথায় কার্যত গণহত্যা চালিয়েছে মার্কিন প্রশাসন; ওদের হাত-মুখ-দাঁত রক্তে মাখামাখি। মার্কিন প্রশাসনের এই গণহত্যাকারী চরিত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বময় ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে; তাকে চাপা দিতে প্রেসিডেন্ট বুশ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছেন, এবং বিপন্ন সর্বহারা ক্রন্দনরত শিশু-নারী-পুরুষের মাঝে দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে ছবি তুলিয়ে তা বিশ্বময় প্রচার করিয়েছেন এবং বাণী দিয়েছেন, 'হায় প্রকৃতি কী ভীষণ! এমন বিপর্যয় কেউ আগে দেখেনি।' যেন তাঁর ও তাঁর সরকারের কিছুই করার নেই ! কত বড় ভণ্ড নরঘাতক এরা !

অনেকের মনে হতে পারে, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবই বোধহয় এই ব্যর্থতার কারণ। কিন্তু না, অর্থই যদি প্রধান কারণ হত তাহলে দরিদ্র কিউবা পারছে কী করে? আসলে সমাজব্যবস্থাটাই এর মূল কারণ। তাই পাশের ছোট্ট দেশ সমাজতান্ত্রিক কিউবা যা পারে, সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা তা পারে না। কতটুকুই বা আর্থিক ক্ষমতা কিউবার! সেই শক্তি দিয়েই তারা সমুদ্রোপকূলে প্রতি বছর আছড়ে পড়া ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করে চলেছে চমৎকার ও সংগঠিতভাবে! এবছরই অর্থাৎ ২০০৫ সালে ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ের আভাস পেয়েই তারা ১৫ লক্ষ মানুষ সহ বহু গবাদি পশু ও খাদ্যদ্রব্য নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয়; মাত্র ১৬ জন মারা যায়। গত বছর ২০০৪ সালে ঝড়ের আগেই ১৩ লক্ষ মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়েছিল; ঝড়ের তাণ্ডবে একজন মানুষও মারা যায়নি।

শুধু নিজের দেশে নয়, ল্যাটিন আমেরিকার যে কোন দেশে, এমনকী খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও যখনই কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা রোগের মহামারী দেখা দিচ্ছে, সেখানে ছুটে যাচ্ছে সমাজতান্ত্রিক কিউবার চিকিৎসক দল, সঙ্গে ওষুধপত্রের বোঝা। এবার ক্যাটরিনা ঝড়ে বিধ্বস্ত নিউ অর্লিয়েন্স ও সংলগ্ন এলাকায় কিউবা পাঠিয়েছে ১০০০ জন চিকিৎসক ও ২৬ টন ওষুধ। চিকিৎসার পাশাপাশি তারা স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের চিকিৎসার ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে।

ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ামাত্র সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের খাদ্য, পানীয়, ওষুধ সরবরাহ করে রক্ষা ও পরে পুনর্বাসন — কিউবার এই সফল উদ্যোগকে রাষ্ট্রসংঘ স্বাগত জানিয়েছে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে ঝড়-বিপর্যয় মোকাবিলায় কিউবা-মডেল অনুসরণের আবেদন করেছে। কিন্তু সেই আবেদন পুঁজি ও মুনাফা চক্রের পায়ের তলায় নিষ্ফল মাথা কুটে মরবে। কারণ, পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের ক্ষমতাই নেই সমাজতান্ত্রিক কিউবার মডেল অনুসরণ করে। কিউবার মডেলের মূল ভিত্তি হচ্ছে জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়বোধ ও সর্বোপরি জনগণকে এই উদ্যোগে সামিল করার ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

সমাজতান্ত্রিক কিউবায় মানবজীবনের সুরক্ষাই প্রধান লক্ষ্য; সেজন্যই তার যাবতীয় আয়োজন। মানুষই তাদের সকল সম্পদ ও শক্তির উৎস। কিউবার প্রেসিডেন্ট বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রো বলেন,"সহায়-সম্পদের ক্ষতি কত হল, সেটা আমাদের কাছে বড় নয়; আমরা তার মোকাবিলা করব। আমাদের কাছে জয় মানে হচ্ছে — মানবজীবনের ক্ষতিটাকে যথাসম্ভব কমিয়ে আনা।" তাই জনগণের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্যে তারা সবচেয়ে বেশি অর্থ বরাদ্দ করে; তাই কিউবার জনগণ, কিউবা রাষ্ট্র ও সরকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ; প্রাকৃতিক বিপর্যয় এলে কী করে মানুষকে বাঁচাতে হবে — সে বিষয়ে তারা আগে থেকে প্রস্তুত থাকে। পূর্বাভাস পেলেই সরকারের নির্দেশে বেসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনী, কমিউনিস্ট কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজে নেমে পড়ে। সমস্ত দিক থেকে যানবাহন এনে সকল মানুষ, গবাদি পশু ও অন্যান্য সম্পদ নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যায়; ঝড় যদি ঘাড়ের উপর এসে পড়ে তবে সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ককেও এই পরিবহনে ব্যবহার করে। অস্থায়ী ক্যাম্পগুলিতে আগে থেকেই খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধপত্র, কম্বল ইত্যাদি মজুত করে রাখে।

মাটানজাস-এ এক হোটেলের জনৈক ম্যানেজার সিলভায়ো রুডরিগ্জ বলেন, "খাদ্যাভাব দেখা দিলে আমাদের যা থাকে তাই আমরা ভাগ করে খাই। কিন্তু সেটা খুব সমস্যা হয় না, কারণ — আমরা তো একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করি। ক্যাম্পের স্থলেই মানুষ পরস্পরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে।" ঝড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘর-বাড়ি নিয়েও মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না। তারা জানে — রাষ্ট্র ও সরকার তাদের পাশে আছে; ঝড়ের পর সব বানিয়ে দেবে। তারা সর্বশক্তি নিয়ে রাষ্ট্র ও সরকারের পাশে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, মানুষ যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনার উৎস — এই সত্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে। মানুষের মধ্যে সুপ্ত সেই বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনাকে রাষ্ট্র জাগরিত করে, সংগঠিত রূপ দেয়; কর্মের মধ্যে সেই শক্তি ও সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে মুক্তিলাভ করে। পূর্বেকার সমাজতান্ত্রিক চীনে বিধ্বংসী ভূমিকম্পের সময় দুনিয়ার মানুষ দেখেছিল, বাইরের কোনও দেশের সহায়তা লাগেনি, দেশের স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ত্রাণ পরিচালনা করেছেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকে।

এ জিনিস কি সম্ভব পুঁজিবাদী দুনিয়ায়? আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি কিংবা ভারতে? তাদের রাষ্ট্রনায়করা কি এ জিনিস কল্পনাও করতে পারে? একটা ঝড় আমেরিকার ভিতরের চেহারাটিকে প্রকাশ করে দিয়ে দেখাল পুঁজিবাদ কত নির্মম, কত বর্বর।

চীনের সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব মহান ও যুগান্তকারী

চারের পাতার পর

ফ্যাসিবাদের দিকে যাচ্ছে, আর ফ্যাসিবাদের দিকে চলে গেছে — দুটো এক অবস্থা নয়। আবার, এই পুঁজিবাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসাবে কখনও কংগ্রেস, কখনও বিজেপি বসছে কেন্দ্রের সরকারে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে সরকারে রয়েছে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সি পি এম, অর্থাৎ পরিস্থিতি সর্বত্র ও সবসময় এক নয়। এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্বের বিশেষ অবস্থান, তার বিচারেই দলের সাধারণ কর্মসূচিরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে যায়। অনেকগুলি দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনটা প্রধান দ্বন্দ্ব, কোন্ দ্বন্দ্বটা বিরোধাত্মক, কোন্টা মিলনাত্মক, আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই যে পরিবর্তনের মূল কারণ — এই সমস্ত দিক বিচার করেই কোনও ঘটনাকে বোঝা, একটা বিশেষ দেশের শ্রমিক বিপ্লবের রণনীতি-রণকৌশল নির্ধারণ করা, এই দিকগুলো মাও সে-তুঙ বিশ্লেষণ করে দেখালেন। তাঁর আগে মার্কসবাদী বিজ্ঞানে এমন করে কেউ এসব বিষয় দেখান নি। শুধু তাই নয়, এমন সহজ-সরল ভাষায়, চীনের ইতিহাস থেকে, পুরাকাহিনী থেকে উপমা দিয়ে তিনি মার্কসবাদের জটিল তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন যাতে নিরক্ষর চাষীরা পর্যন্ত তা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারে। আমার মনে আছে, ১৯৭৪ সালে কটকে ছাত্রদের একটা সভায় কমরেড শিবদাস ঘোষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, আমি শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে মার্কসবাদ আলোচনা করি এবং দেখেছি, তারা তাদের শ্রেণীগত অবস্থানের জন্য এর মর্মবস্তু অনেক বুদ্ধিজীবীর থেকে ভাল বুঝতে পারে। মার্কস-এঙ্গেলসের ঐতিহাসিক ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে স্ট্যালিন যেমন সহজ সরল করে উপস্থিত করেছিলেন, মাওয়ের এই দুটি রচনাও তেমনি। গোটা দুনিয়ায় একসময় এই দুটি বই আলোড়ন তুলেছিল। আমাদের দলেও এটা অবশ্যপাঠ্য ছিল, আমরা পড়েছি। আজও বিপ্লবের প্রয়োজনেই এই বইগুলি কমরেডদের গভীরভাবে পড়া ও বোঝা দরকার ; দেশের শ্রমিক-চাষীদের মধ্যে এই চিন্তা নিয়ে যাওয়া দরকার। মাও যখন এসব বিষয় আলোচনা করেছেন, তখন তিনি চারদিক দিয়ে শত্রুবেষ্টিত, আক্রমণ হচ্ছে। রণক্ষেত্রে বসেই দলের কর্মীদের, শ্রমিক-চাষীদের চেতনার মান উন্নত করার জন্য তিনি দর্শনের এইসব জটিল বিষয়ের উপর সহজ ভাষায় সমৃদ্ধ আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরাট অবদান রেখেছেন। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মার্কসবাদী বিচারধারা কী হবে, তা লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করে দেখান ইয়েনানে থাকার সময়, যেটাও দুনিয়ায় আলোড়ন তুলেছিল। দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে গেরিলাযুদ্ধের রণনীতি ও কৌশল কী হবে, তা নিজের সংগ্রামের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বিশ্বের বিপ্লবীদের কাছে জীবন্ত রূপে তুলে ধরেছেন। এভাবেই চীনের বিশেষ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে বিশেষীকৃত করার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন।

এই মহান নেতার বহু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাই আমাদের বারবার স্মরণ করতে হয়। তিনি বলছেন, ‘আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমার ধারণা ছিল বুদ্ধিজীবীরাই সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, চাষী-মজুরা অপরিষ্কার। পরে বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, আমি আগে পেটিবুর্জোয়া মানসিকতার শিকার ছিলাম। আসলে মধ্যবিত্ত, পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মনটা পরিষ্কার নয়, অনেক ভণ্ডামি আছে, এরা মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। শ্রমিক-চাষী, যাদের পায়ে গোবর, হাতে কাদা-মাটি, ময়লা ছিন্ন পোষাক, তারাই মনের দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে অনেক বেশি পরিষ্কার।’ কর্মীদের বলেছেন, জনগণের মধ্যে শেখাবার মন নিয়ে যাবে না, শিখবার মন নিয়ে যাও। মাওয়ের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা — ‘ফ্রম দি মাসেস, টু দি মাসেস’, যার অর্থ, জনগণের কাছ থেকে নানা চিন্তা, মতামত, অভিজ্ঞতা, যেগুলো বিচ্ছিন্ন, অগোছালো হবে, বিভ্রান্তিও থাকবে, সেগুলি নেতা-কর্মীদের সংগ্রহ করতে হবে। পার্টির কাজ হচ্ছে সেই টুকরো-টুকরো অগোছালো ভাবনা-চিন্তাকে সুসংবদ্ধ রূপ দিয়ে দলের কর্মসূচি হিসাবে জনগণের কাছে আবার নিয়ে যাওয়া, তাদের দিয়ে গ্রহণ করানো। আন্দোলনের কর্মসূচি, বিপ্লবের কর্মসূচিকে যতক্ষণ জনগণ নিজেদের বলে গ্রহণ না করছে, কার্যকরী গণআন্দোলন গড়ে উঠবে না — বিপ্লব তো নয়ই।

মহান নেতা বলেছেন, আমাদের বিরুদ্ধে যার যত সমালোচনা আছে, সাদরে তা আহ্বান করো। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুরোপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ, তাই তা সত্য ও অপরাজেয়। তা কোনও সমালোচনাকে ভয় পায় না, বরং তা সাদরে আহ্বান করে। আমরা সঠিক সমালোচনা থেকে শিখব, ভুল ও মিথ্যা সমালোচনার সঠিক জবাব দেব। বলেছেন, মিথ্যা-সত্যের দ্বন্দ্ব, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব থাকবেই, মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করেই সত্যের, অসুন্দরের বিরুদ্ধে সুন্দরের বিকাশ। তিনি বলেছেন, আমরা যতই আন্দোলন-সংগ্রাম করি, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বিজ্ঞান আয়ত্ত করতে না পারলে এগোতে পারব না।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে মাও সে-তুঙের ঐতিহাসিক সংগ্রাম অবিস্মরণীয়। মুখে মার্কসবাদের কথা বলে কাজে-কর্মে-চিন্তায় পুঁজিবাদের চর্চাই হচ্ছে সংশোধনবাদ। ১৯৫৬-৫৭ সালে মাও যখন চীনে কৃষির সমাজতন্ত্রীকরণের ডাক দিলেন, দলের মধ্যে আবার বিতর্ক দেখা দিল। একদল বলল, উৎপাদনই প্রধান কথা, উৎপাদন বাড়াবার জন্য কৃষিতে এখনও পুঁজিবাদ বহাল রাখতে হবে। মাও বললেন, না, উৎপাদন নয়, রাজনীতিই হচ্ছে প্রধান এবং সেই রাজনীতির মূল কথা হচ্ছে শ্রমিক-চাষীর স্বার্থে শ্রেণীসংগ্রাম, তাতেই সমাজতন্ত্র রক্ষা পাবে, উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী চিন্তার পথিক লিউ শাও চি ও তাঁর সাথীরা, যাদের মাও বলেছেন পুঁজিবাদের পথিক, তাঁরা এর প্রবল বিরুদ্ধতা করেছিলেন, কিন্তু বাধা দিতে পারেননি। মাওয়ের নেতৃত্বে এই সমাজতন্ত্রীকরণ দেশের ভিতরে ও বাইরে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল। প্রথমে কিছুটা ধাক্কা খেলেও, খাদ্যসঙ্কট দেখা দিলেও, কয়েক বছরের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে যায়, আবার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। চীনের পার্টির ভিতরকার আদর্শগত সংগ্রাম বুঝিয়ে দিয়ে যায় যে, সংশোধনবাদী চিন্তা দলের একেবারে উচ্চতম নেতৃত্বের মধ্যে কাজ করছে। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ সালে মহান স্ট্যালিনের মৃত্যু হয়েছে। গোটা দুনিয়ার কমিউনিস্টরাই কেবল নয়, যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতাপ্রিয় কোটি কোটি মানুষ শোকে মুহ্যমান। মাও বললেন, ‘শোককে পরিণত করো শক্তিতে’।

মহান স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর যখন ক্রুশ্চেভ-চক্র ক্ষমতায় এসে সংশোধনবাদী লাইন নিয়ে এল, এবং সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রতিবিপ্লবী শক্তি ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল, তার বিরুদ্ধে মাও সে-তুঙের নেতৃত্বে চীনের পার্টি অসামান্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হল। কমরেড শিবদাস ঘোষের নেতৃত্বে আমাদের পার্টি চীনের পার্টির এই ভূমিকাকে সমর্থন করেছে, তাদের ও আমাদের বক্তব্যে মিল ছিল অনেকটাই। আবার, তাদের কিছু কিছু মূল্যায়ন সম্পর্কে এবং সমালোচনার ধরন নিয়ে আমাদের মতপার্থক্য ছিল। আবার, ১২ পার্টি ও ৮১ পার্টির বৈঠকে যখন চীনের পার্টি ঐক্যের নামে নীতিহীন আপস করেছে, তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ সেই ভুলকেও দেখিয়েছেন। বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে আমাদের পার্টি বরাবর এই ভূমিকা পালন করেছে। সংশোধনবাদের উত্থান ও তার বিকাশের কারণ সম্পর্কে এবং সেই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রশ্নে কমরেড শিবদাস ঘোষ অমূল্য পথনির্দেশ রেখে গিয়েছেন।

পরবর্তীকালে চীনে যখন লিউ শাও-চি, দেং শিয়াও-পিঙদের নেতৃত্বে প্রতিবিপ্লবের বিপদ এসে গেল, কেন্দ্রীয় কমিটির বেশিরভাগ সদস্য সংশোধনবাদের রাস্তা ধরে পুঁজিবাদী পথে চলে গেল, তখন মাও সে-তুঙের অনেক বয়স হয়েছে, অসুস্থ। তিনি তখন চীনের অদ্বিতীয় নেতা, তিনি আপস করলে, বিরোধী কেউ ছিল না। কিন্তু সেটা তাঁর পথ নয়। তিনি বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য ওই বয়সে আবার রাস্তায় দাঁড়ালেন। গোটা চীনের জনগণকে আহ্বান জানিয়ে বললেন, পার্টির নেতৃত্বের দ্বারাই সমাজতন্ত্র বিপন্ন, তাকে রক্ষা করতে হলে আর একটা বিপ্লব দরকার। সেটাই হল চীনের ঐতিহাসিক সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে পার্টির মধ্যে ‘ক্ষমতার লড়াই’, ‘অরাজকতা’ বলে কুৎসা করেছে। কমিউনিস্ট বলে পরিচিত অনেক পার্টিও বলেছে, নেতাই পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন, পার্টির ভিতরকার আদর্শগত সংগ্রামকে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাচ্ছেন, এর দ্বারা মাও-ই সমাজতন্ত্রকে দুর্বল করছেন। ফলে তারা একে সমর্থন করতে পারেনি। সেই সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বলিষ্ঠভাবে ওই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে সমর্থন করে তাকে ‘মহান’ ও ‘যুগান্তকারী’ আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রে এই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জরুরি প্রয়োজন কোথায়। আজ তো একথা প্রমাণ হয়ে গেছে, মহান মাওয়ের হুঁশিয়ারি কত সঠিক ছিল। মাওয়ের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করেই দেঙ-রা নেতৃত্ব কব্জা করে চীনকে পুঁজিবাদী পথে নিয়ে গেল। বিশ্বের পুঁজিবাদীরাও বলছে, চীনে এখন বাজার অর্থনীতি। আমাদের পার্টিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে জানিয়ে দিয়েছে যে, চীন আর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র নেই, তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে অধঃপতিত হয়েছে।

সমাজতন্ত্রে পুঁজিবাদের এই বিপদ সম্পর্কে বলতে গিয়েই মাও দেখালেন, অর্থনৈতিক কাঠামোর বৈপ্লবিক বদল ঘটলেও মানুষের ভাবনা চিন্তায়, সংস্কৃতিতে পুরানো প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাভাবনা থেকে যায়। এদেশে কমরেড শিবদাস ঘোষের কাছ থেকেও আমরা একই বক্তব্য পেয়েছি। মাওয়ের বক্তব্য আমাদের হাতে এসেছে পরে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছেন, অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলে গেলেই যারা মনে করে উপরকাঠামো তৎক্ষণাৎ বদলে যায়, তারা এই দুইয়ের মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বোঝে না। আর বলেছেন, অর্থনীতি যদিও ভিত্তি, তবুও উপরকাঠামো হিসাবে চিন্তা-আদর্শ ব্যাপকভাবে ভিত্তিকে প্রভাবিত করে। এভাবেই মার্কস-এঙ্গেল্সের মূল শিক্ষাকে এই দুই মহান নেতা ব্যাখ্যা করে আমাদের বুঝিয়েছেন। এখান থেকেই আমরা আজকের একটি মূল প্রশ্নের জবাব পেতে পারি। সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের পতন, চীনের সমাজতন্ত্রের পতন থেকে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, কেন এ জিনিস ঘটল ? তবে কি সমাজতন্ত্র অবাস্তব চিন্তা ?

কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়েছেন যে, আদর্শগত চেতনার নিম্নমান থেকেই কমিউনিস্ট আন্দোলনে আধুনিক সংশোধনবাদের জন্ম হয়েছে। তিনি আরও দেখান যে, ব্যক্তিবাদ, যা পুঁজিবাদের বিকাশের যুগে সমাজপ্রগতিতে সহায়তা করেছিল, আজ প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের যুগে সেই বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদ প্রগতির পথে বিরাট বাধা। এটাই সমাজতন্ত্রে ভিন্ন রূপে ‘সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিবাদ’ হিসাবে দেখা দেয়, যা সামাজিক স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিস্বার্থকে মিশে যেতে দেয় না, সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে ব্যক্তির প্রয়োজনের সংঘাত তৈরি করে। তাই আজকের যুগে, কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখালেন, বিপ্লবের স্বার্থ তথা সামাজিক স্বার্থের কাছে ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন করাই কমিউনিস্ট চরিত্র অর্জনের মূল সংগ্রাম। এছাড়া আজ বিপ্লবও করা যাবে না, বিপ্লবকে রক্ষাও নয়।

১৮৭১ সালে ফ্রান্সের প্যারী কমিউন ছিল বিশ্বে প্রথম শ্রমিক বিপ্লব। কিন্তু তাকে রক্ষা করা যায়নি, শোষকশ্রেণী তা ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই ঘটনা থেকে মার্কস-এঙ্গেল্স শিক্ষা নিয়ে বললেন, পুরানো রাষ্ট্রকে অক্ষত রেখে বিপ্লব সফল হবে না। এই শিক্ষার ভিত্তিতে রাশিয়ায় লেনিন, চীনে মাও রাষ্ট্রবিপ্লব করলেন। এই দুই বিপ্লবের সাময়িক ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা নতুন শিক্ষা দিল, বিপ্লব রক্ষা করতে হলে ব্যক্তিবাদকে নির্মূল ও জীবন সম্পর্কে এতদিনকার দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। এই কাজ অত্যন্ত কঠিন, আমরা নিজেরাও দলের মধ্যে তা বুঝতে পারছি। কিন্তু পথ এটাই। একথা পরিষ্কার যে, বর্বর পুঁজিবাদী সভ্যতা শেষ কথা নয়, সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ ইতিহাস নির্ধারিত ভবিষ্যৎ। আমরা ভুলে যেতে পারি না যে, মধ্যযুগীয় শোষণমূলক সামন্তী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে শোষণমূলক পুঁজিবাদকে একটি বিশ্বব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে বুর্জোয়াশ্রেণীর কয়েক শতক সময় লেগেছে। সেখানে শোষণহীন সমাজতন্ত্রের বয়স মাত্র ৭০ বছর হয়েছিল। আরও বহু বিপ্লব, আর বহু চড়াই-উৎরাই পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। এই সংগ্রামে বিশ্বের সকল দেশের বিপ্লবীদের কাছে মার্কস-এঙ্গেল্স-লেনিন-স্ট্যালিনের মতই মাও সে-তুঙ এক উজ্জ্বল তারা হিসাবে বিরাজ করবেন। মানবসভ্যতার এই মহান সন্তানদের সম্পর্কে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা, তাদের গোলাম কলমচি ও বুদ্ধিজীবীরা যতই কুৎসা করুক, মিথ্যা রটাক, তার দ্বারা এঁদের মহত্ত্ব ও যুগান্তকারী ভূমিকা ও

সাতের পাতায় দেখুন

> তিনি বলছেন, ‘আমি যখন ছাত্র ছিলাম, আমার ধারণা ছিল বুদ্ধিজীবীরাই সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন, চাষী-মজুরা অপরিষ্কার। পরে বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছি, আমি আগে পেটিবুর্জোয়া মানসিকতার শিকার ছিলাম। আসলে মধ্যবিত্ত, পেটিবুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মনটা পরিষ্কার নয়, অনেক ভণ্ডামি আছে, এরা মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। শ্রমিক-চাষী, যাদের পায়ে গোবর, হাতে কাদা-মাটি, ময়লা ছিন্ন পোষাক, তারাই মনের দিক দিয়ে মানুষ হিসাবে অনেক বেশি পরিষ্কার।’

মহান মাও সে তুঙ স্মরণে

ছয়ের পাতার পর

অবদানকে সামান্যতম ম্লান করতে পারবে না, নিজেরাই শুধু নিজেদের মানবসভ্যতার শত্রু বলে প্রমাণ করবে।

কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

সভাপতির ভাষণে কমরেড অসিত ভট্টাচার্য বলেন, আজকের এই সভা মহান নেতা মাও সে-তুঙের প্রতি নিছক শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুষ্ঠান নয়, বিশ্বের সকল কমিউনিস্টদের কাছে আজ সংগ্রাম তীব্রতর করার সঙ্কল্প নেওয়ার দিন। মৃত্যুর ২৯ বছর পরেও তাঁর নাম একদিকে যেমন বিশ্বের সকল দেশের বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীদের খুঁটি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। তাই তাঁর নামে এখনও কুৎসা রটনার কাজ চলছে।

তিনি বলেন, মাও সে-তুঙের মতো চরিত্র আকছার দেখা দেয় না। একদিকে সামাজিক প্রয়োজন, অন্যদিকে সেই প্রয়োজনের উপলব্ধির ভিত্তিতে বিজ্ঞানসম্মত দর্শন ও তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আপসহীন সংগ্রাম করার পথেই এঁদের উদ্ভব হয়। সুতরাং, তাঁকে বুঝতে গেলে যে দর্শন তিনি চর্চা ও জীবনে প্রয়োগ করেছেন ও যেভাবে করেছেন, তার খুঁটিনাটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। মহান লেনিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব ছিল তাঁর সামনে লক্ষ্য। কিন্তু মাও তার অন্ধ অনুকরণ করেননি। রুশ বিপ্লব ও লেনিনের শিক্ষার ভিতরের বিজ্ঞানকে বুঝে চীনের পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে সৃজনশীল ভাবে প্রয়োগ করেছেন। চীনের মতো অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া একটি দেশে যেভাবে তিনি বিপ্লবী তত্ত্বের ভিত্তিতে জনগণকে জাগ্রত করেছেন, তা অবিশ্বাস্য মনে হয়। ১৯৩৫ সালে তিনি পার্টির নেতৃত্বে আসেন, তারপর ১৪ বছরের মধ্যে ১৯৪৯ সালে সফল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তিনি চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেন। সঠিক তত্ত্ব ও তার সঠিক প্রয়োগই এই সাফল্যের ভিত্তি। বিমূর্ত মার্কসবাদী দর্শন ও বিজ্ঞানকে তিনি চীনের মাটিতে মূর্ত করে তুললেন, চীনের মানুষের জীবনের সমস্যার সাথে মিলিয়ে তাকে জনগণের মনে গেঁথে দিলেন। এ'কাজটা সকল দেশের বিপ্লবীদেরই করতে হবে। ১৯৪৯ থেকে ১৯৬০ — এই ১১টি বছরে তাঁর নেতৃত্বে চীনের জনগণের আর্থিক উন্নতিও ছিল লক্ষণীয়। লেনিন-স্ট্যালিনের রাশিয়াতেও উৎপাদন ও জীবনমানের বিকাশ ঘটেছিল ব্যাপকভাবে। অতএব যাঁরা বলেন, মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র উৎপাদনের বিকাশ ঘটাতে পারেনি বা তা পারে না, তাঁরা ভ্রান্ত। একথা সত্য যে, রাশিয়া ও চীনে প্রতিবিপ্লব হয়েছে, কিন্তু প্রতিবিপ্লব যদি ৫০/৬০ বছরও স্থায়ী হয়, তবুও ইতিহাসের এই সত্যকে খণ্ডন করা যাবে না যে, রাশিয়া, চীনে ও অন্যান্য দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদ সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। মাও সে-তুঙ যেভাবে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে চীনের পরিস্থিতিতে সৃজনশীলভাবে প্রয়োগ করেছেন, নতুন সমস্যার উত্তর করতে গিয়ে মার্কসবাদী তত্ত্বকে বিকশিত করেছেন, ভারতবর্ষের বিপ্লবের প্রয়োজনে আমাদেরও তা করতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ ব্যক্তিবাদের যে গুরুতর সমস্যার প্রতি বারবার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আজকের যুগে ব্যক্তিসম্পত্তিবোধ থেকে মুক্ত না হতে পারলে কমিউনিস্ট হওয়া যাবে না বলে তিনি যে শিক্ষা দিয়েছেন, তাকে নিজেদের যেমন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে, দেশের জনগণের মধ্যেও তা নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলেই আমাদের, তথা প্রতিটি দেশের বিপ্লবীদেরই সর্বপ্রথম নিজেদের জীবনে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা করতে হবে। একমাত্র এই পথেই আমরা বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব। আসুন, এই সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করার সঙ্কল্পই আজ আমরা গ্রহণ করি।

আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভা শেষ হয়।

জনগণ কী করে বাড়তি ভাড়া দেবে সরকার তা ভাবে না

একের পাতার পর

সাথে বলেছেন, বাসমালিকদের এই অন্যায় দাবি সরকার কোনমতেই মেনে নেবে না, সেস বা বিক্রয়কর কমিয়ে ভাড়ার হার কম রাখার কোনও পরিকল্পনা তাঁদের নেই। ফলে বাসের ভাড়া বাড়বেই এবং তা বাড়ানো হবে পুজোর আগে।

অর্থাৎ পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির সম্পূর্ণ বোঝাটি সুভাষবাবুরা জনসাধারণের কাঁধে চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। সরকারের ভাণ্ডারে টাকা নেই, সেজন্যই নাকি কর-সেস তুলে নেওয়া অথবা কমানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কি পরিবহণমন্ত্রী ও তাঁর সরকার একথাই মনে করেন যে, সাধারণ মানুষের অগাধ টাকা? কর-দর-খাজনা বৃদ্ধির জ্বালায় জর্জরিত মানুষকে পরিবার-পরিজনের মুখে দু-মুঠো ভাত তুলে দিতে কীভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে কোনও ধারণা কি এই সরকারের নেতা-মন্ত্রীদের আছে ? তাঁরা কি জানেন, শুধু অর্থের অভাবে সন্তানকে একটু শিক্ষা দেওয়ার কত স্বপ্ন প্রতি মুহূর্তে শুকিয়ে যায়? পয়সার অভাবে চিকিৎসা না পেয়ে কত সজীব প্রাণ অকালে ঝরে যায়, এয়ার-কন্ডিশন্ড ঘরের গদি-আঁটা চেয়ারে বসে দিন-কাটানো সুভাষবাবুদের মতো মানুষদের সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা আজ আর আছে কি ? সামনে-পিছনে সিকিউরিটি নিয়ে সাইরেন বাজিয়ে বিলাসবহুল দামী গাড়িতে যাতায়াত করতে অভ্যস্ত সি পি এম-ফ্রন্টের মন্ত্রী-আমলারা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেন না যে, আজ কত নিরুপায় মানুষ বাসভাড়া জোগাড় করতে না পেরে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে কর্মস্থলে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন! এই অস্বাভাবিক পরিবহণ-খরচ জোগাড় করতে কত খেটে-খাওয়া মানুষকে যে আজ পেটের খিদে পেটেই মারতে হচ্ছে, সে সব বোধহয় আজ আর তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন না। কারণ এই সরকার আজ সম্পূর্ণ জনবিচ্ছিন্ন ; দেশের ৮০ ভাগ সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের খোঁজ আজ সে আর রাখে না।

এ এক অদ্ভুত উদাসীন নির্মম সরকার ! ভোটের আগে জনকল্যাণের মনমোহিনী বুলিতে সরকারি দলের ভোটপ্রার্থীদের মুখে খই ফোটে ; অসচেতন, অসংগঠিত সাধারণ মানুষকে রঙিন স্বপ্ন দেখাতে রঙিন পোস্টারে ছেয়ে যায় মাথার উপরের আকাশ। ভোটে জিতে সরকার গঠনের পরেই প্রকাশ পায় এই দলগুলির আসল চেহারা। সরকারের টাকা নেই এই অজুহাত দেখিয়ে তেলের দামবৃদ্ধির পুরো বোঝা সাধারণ মানুষের উপর চাপাতে এদের বাধে না, অথচ এরা একথার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করে না যে, তাহলে সরকারের আদায় করা বিপুল অর্থ যাচ্ছে কোথায়। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমছে, শিক্ষাখাতে ব্যয় কমছে, গ্রামোন্নয়ন হচ্ছে না, বন্যা-ভাঙনে সর্বস্বান্ত হচ্ছে মানুষ, শহরের নিকাশী ব্যবস্থার চূড়ান্ত দুরবস্থা, ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার মতো হারিয়ে যাওয়া রোগ নতুন করে ফিরে এসে মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে ; সরকার নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ জনগণের কাছ থেকে আদায় করা ট্যাক্স সহ অন্যান্য অর্থ জনগণের কোনও কল্যাণেই তারা ব্যয় করছে না। তাহলে কি পুরো টাকাটাই চলে যাচ্ছে পার্ক-ফ্লাইওভারে শহর সাজিয়ে ধনী পুঁজিমালিকদের মনোরঞ্জনে আর মন্ত্রী-নেতা-আমলাদের বিলাস-বহুল জীবনযাপনের রসদের যোগান দিতে ?

বোধহয় তাই। কারণ, খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি কণামাত্র দায়বদ্ধতা সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের আজ আর নেই। তা যদি থাকত, তাহলে 'বাসের ভাড়া বাড়বেই' দম্ভের সাথে একথা উচ্চারণ করার আগে রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী বাসভাড়া-নির্ধারক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা ভাবতেন, যে কমিটি তেলের দামবৃদ্ধির ফলে বাসমালিকদের প্রকৃতই লোকসান হচ্ছে কিনা, নাকি মুনাফার পরিমাণ খানিকটা কমছে, তা হিসাব করবে এবং জনসাধারণের কথা ভেবে ন্যায্য বাসভাড়া নির্ধারণ করবে। তাছাড়া এই বিশেষজ্ঞ কমিটি, বাসমালিকরা কিলোমিটার হিসাব করে যে ভাড়া নেয়, তার মাপও সঠিক কিনা তা খতিয়ে দেখবে। বহুদিন ধরেই আমাদের দল এস ইউ সি আই এই ধরনের কমিটি গঠনের কথা বলে আসছে।

জনজীবনের দুঃখ-দুর্দশা-সঙ্কটের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি থাকলে এই সরকার, জরিমানার নামে পুলিশ বহুক্ষেত্রে ঘুষ এবং অন্যায়-ভাবে যে অর্থ আদায় করে, তা বন্ধ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিত। কারণ বাসমালিকরা বলছেন, পুলিশের এই টাকা জোগাতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়ে যাওয়ার দরুণ তেলের দাম বাড়লেই ভাড়াবৃদ্ধি করার দাবি করতে হয় তাঁদের। সদিচ্ছা থাকলে সরকার পুলিশ বিভাগের এইসব অনৈতিকতা দূর করতে পারে না এমন নয় ; অথচ তা তারা করবে না। অর্থাৎ, পুলিশবিভাগের দুর্নীতির দায়ভারও বহন করতে হবে সেই জনগণকেই।

জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করে ন্যূনতম পরিষেবা বজায় রাখার যে দায়িত্ব সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের ছিল, সেকথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে ব্যয়বৃদ্ধি-মূল্যবৃদ্ধির যাবতীয় বোঝার চাপে সাধারণ মানুষের জীবনকে আজ তারা পিষে মারছে। তা না হলে এইভাবে নির্বিচারে বাসের ভাড়া না বাড়িয়ে বিক্রয়কর ও সেস তুলে নেওয়া, নিদেনপক্ষে কমানো এবং পুলিশের অন্যায়ভাবে যথেচ্ছ অর্থ আদায় বন্ধ করার চেষ্টা তারা করত ; একই সঙ্গে পেট্রল-ডিজেলের উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে সেস চাপিয়ে রেখেছে, তা তুলে নেবার দাবিতেও সোচ্চার হত। ১৯৯১ সালে ঘটে যাওয়া উপসাগরীয় যুদ্ধ ও জাতীয় সড়ক উন্নয়নের অজুহাতে লিটার পিছু ৩ টাকা করে যে কেন্দ্রীয় সেস আদায় করা হয়, কিছুদিন আগে সি পি এম-সি পি আই-এর মতো তথাকথিত বাম দলগুলি তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের এক নাটক শুরু করেছিল। কেন্দ্রে আজ এদেরই সমর্থনে 'বন্ধু' সরকার ক্ষমতাসীন। অথচ কেন্দ্রীয় সেস প্রত্যাহারে তাকে বাধ্য করা দূরে থাক, সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের শরিক দলগুলি আজ আর তার বিরুদ্ধে টুঁ শব্দ করছে না। বরং পেট্রল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির কেন্দ্রীয় সরকারী সিদ্ধান্তের তারা আজ সমর্থক। তারা সমর্থন না করলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই মূল্যবৃদ্ধি সম্ভব হতনা।

ফলে একথা স্পষ্ট যে, জনজীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, উদাসীন, নির্মম, নিষ্ঠুর এই সরকার জনগণের বিন্দুমাত্র কল্যাণ করবে না। সাধারণ মানুষকে একথা বুঝতে হবে যে, সংগঠিত ও লাগাতার গণআন্দোলনের তীব্র চাপে এই সরকারকে জনকল্যাণে বাধ্য করা ছাড়া বাঁচার অন্য কোনও উপায় নেই।

ঋণগ্রহীতাদের উপর প্রশাসনিক হয়রানির প্রতিবাদে বালুরঘাটে ডেপুটেশন

বটুন, পাইকপাড়া, মাদারীগঞ্জ সহ বালুরঘাট থানার কয়েকটি অঞ্চলের লোনিদের কাছে নোটিশ পাঠানো হয় যে, ১ সেপ্টেম্বর বেলা ১২টায় জেলা সার্টিফিকেট অফিসারের হাতে তাদের বকেয়া সুদ সহ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে, নচেৎ তাদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হবে এবং অনাদায়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করবে। এই প্রশাসনিক হুমকির প্রতিবাদে উপরোক্ত এলাকার ঋণগ্রহীতাদের সংগঠিত করে সারা ভারত স্বনিযুক্তি সংগ্রাম সমিতির বালুরঘাট থানা শাখার উদ্যোগে গত ১ সেপ্টেম্বর বালুরঘাটে জেলাশাসক দপ্তরে সার্টিফিকেট অফিসারকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অবিলম্বে লোনিদের হয়রানি ও হুমকি দেওয়া বন্ধ করা, ক্রোকের নোটিশ প্রত্যাহার, সমস্ত সুদ মকুব, আসল টাকার ৫০ শতাংশ ছাড় এবং বাকি ৫০ শতাংশ দীর্ঘমেয়াদী কিস্তিতে পরিশোধের সুযোগ প্রদান, অবিলম্বে সমস্ত মামলা প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে স্মারকলিপি সার্টিফিকেট অফিসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন অজিত সাহা, নৃপেন্দ্রনাথ লাহা, বাবুলাল সাহা ও নন্দা সাহা। সার্টিফিকেট অফিসার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লোনিদের বক্তব্য পৌঁছে দেওয়ার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করবেন বলে জানান। ঋণগ্রহীতাদের সামনে বক্তব্য রাখেন নন্দা সাহা ও বীরেন মহন্ত। পরিশেষে সরকারের এই প্রতারণা প্রকল্পের বিরুদ্ধে ও প্রশাসনের এই অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোনিদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান স্বনিযুক্তি সমিতির রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি দীপক ব্যানার্জী।

মদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে মহিলাদের বিক্ষোভ

মদের ঢালাও লাইসেন্স দেওয়ার প্রতিবাদে ১ সেপ্টেম্বর সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির ডাকে দেড় শতাধিক মহিলা জেলা কালেক্টরেট গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। সংগঠনের জেলা সম্পাদিকা কমরেড অনিতা মাইতি বলেন, এমনিতে মা-বোনেদের নিরাপত্তা নেই, মেয়েরা ঘরে বাইরে অত্যাচারের স্বীকার হচ্ছে, ৩ বছরের শিশু থেকে ৬০ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত ধর্ষিতা হচ্ছে। এরপর মদের দোকান বাড়লে মদ সহজলভ্য হবে, তার ফলে মাতলামি বাড়বে, নারীর উপর অত্যাচারও বাড়বে। তিনি বলেন, সরকার সাধারণ মানুষের জন্য চিকিৎসা, শিক্ষা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করছে না, কিন্তু মদ সবাই যাতে সহজে পায় তার জন্য ঢালাও লাইসেন্স দিচ্ছে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত কোনমতে মেনে নেওয়া যায় না। এদিনের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সভানেত্রী সুনীতা গুপ্তা, কল্পনা মজুমদার, ঝর্ণা জানা, স্মৃতি দাস, দিপালী সাহু প্রমুখ।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06 R. No 5268 / 60

বিহারে লোকজনশক্তির সাথে এস ইউ সি আই-এর সমঝোতার সংবাদ সত্য নয়

বিহার রাজ্য কমিটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, লোকজনশক্তি পার্টির প্রধান রামবিলাস পাশোয়ান এক সাংবাদিক সম্মেলনে, বিহার নির্বাচনে তাঁদের তথাকথিত তৃতীয় মোর্চার শরিক হিসাবে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর নাম যে উল্লেখ করেছেন তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই। আমরা কোনও পর্যায়েই লোকজনশক্তি পার্টির সাথে এ নিয়ে কোনও আলোচনা করিনি। আমরা এর শরিক নই শুধু নয়, আমরা এ'ধরনের নির্বাচনী জোটের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। আমরা সবসময়ই চেষ্টা করেছি, সমস্ত বামপন্থী দল ঐক্যবদ্ধভাবে একটা সুস্পষ্ট বামপন্থী লাইন নিয়ে গণআন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করুক, যা মূলত সি পি এম-সি পি আই-এর জন্য কখনও সম্ভব হয়নি।

ডেঙ্গু ঃ হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির উদ্যোগে নাগরিক সভা

দেশের অন্যতম 'এ ওয়ান' সিটি কলকাতায় যখন ডেঙ্গু সংক্রমণ মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং রাজ্য সরকার ও কলকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমাহীন উদাসীনতায় চিকিৎসা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, তখন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের পরামর্শের ভিত্তিতে মাস্টারপ্ল্যান তৈরি করে প্রতিরোধ অভিযানে নামার দাবি জানাল হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি। ১৩ সেপ্টেম্বর মহাবোধি সোসাইটি হলে আয়োজিত দাঁড় করানোর দাবি জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ঃ জয়নগর ১নং ব্লকের পদ্মেরহাট হাসপাতালের উন্নয়নের দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর বি এম ও এইচ এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন নুরহোসেন মোল্লা, সুমন্ত গাঙ্গুলী, সফি পৈলান, ডাঃ হান্নান হালদার, মাধবী প্রামাণিক, আকবর মিস্ত্রী প্রমুখ।

বাঁকুড়া ঃ বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতালের

৮ সেপ্টেম্বর স্কটিশচার্চ কলেজ অডিটোরিয়ামে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও সাম্প্রতিক অজানা জ্বর বিষয়ে সেমিনার

এক নাগরিক প্রতিবাদ সভায় এই দাবি উত্থাপিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পান্নালাল ব্যানার্জী, প্রস্তাব পাঠ করেন ডাঃ অংশুমান মিত্র। কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য গত ৫ মাস ধরে মশা মারা এবং অন্যান্য পরিষেবার কাজ বন্ধ থাকায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ বেড়েছে বলে সাফাই দিয়ে বর্তমান মেয়র নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার যে নজির সৃষ্টি করেছেন প্রস্তাবে তার তীব্র নিন্দা করা হয়। নাগরিক সভায় বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত, সাংবাদিক গীতেশ শর্মা, শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল, প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি পৃথ্বীশ বসু, শিক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা তপন রায়চৌধুরী, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, ডাঃ শ্যামাপদ দত্ত, চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল। শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান চিত্রাভিনেত্রী সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। নাগরিক সভায় সমস্ত চিকিৎসক সংগঠন, সমাজসেবী সংগঠন ও এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কর্পোরেশনকে জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কমিটি গড়ে তুলে নজরদারি ব্যবস্থা বহির্বিভাগ থেকে মনোরোগ বিভাগ তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে ১ সেপ্টেম্বর হাসপাতাল সুপারের দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখান হয়। রোগীর আত্মীয়রাও এতে সামিল হন। আন্দোলনের চাপে সুপার মনোরোগ বিভাগ চালু রাখার নোটিশ দিতে বাধ্য হন। জীবনদায়ী ওষুধ সরবরাহ, ২৪ ঘণ্টা ই সি জি এবং এক্সরে ব্যবস্থা, সাপে কাটা ও কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ সরবরাহের দাবি জানান হয়। বক্তব্য রাখেন দিলীপ কুণ্ডু।

মুর্শিদাবাদ ঃ বহরমপুরে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতাল চালু, আর্সেনিক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবিতে ৭ সেপ্টেম্বর জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অবস্থান পালিত হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের নেতা ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, সাজেম আলি, ডাঃ জয়শঙ্কর মণ্ডল, ডাঃ রবিউল আলম, বরুণ মণ্ডল প্রমুখ। আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়নের পক্ষে অবনীশ সিন্‌হা।

• কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার • সস্তা দরে সার-বীজ-তেল সরবরাহ
• খেতমজুরের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে • কৃষক উচ্ছেদ করে
দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের জমি উপঢৌকন দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিরোধে

২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায়

কৃষক ও খেতমজুরদের রাজ্য কনভেনশন

স্থান ঃ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, কলকাতা

এ আই কে কে এম এস

হরিণঘাটায় কে কে এম এস-এর নেতৃত্বে পথ অবরোধ, লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার, বন্‌ধ

কৃষকরা চেয়েছিল পাটের ন্যায্য দাম, পেল পুলিশের বর্বর লাঠি। তারই প্রতিবাদে ১৬ সেপ্টেম্বর কে কে এম এস হরিণঘাটায় ১২ ঘন্টা বন্‌ধের ডাক দেয়। এস ইউ সি আই এই বন্‌ধকে সমর্থন জানায়। বিশ্বকর্মা পুজোর আগের দিন এই বন্‌ধ শাসকদলের বাধা সত্ত্বেও সর্বাত্মক সফল হয়।

সরকারকে উদ্যোগী হয়ে লাভজনক দামে পাট কেনা এবং কৃষি-বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে গত ১৫ সেপ্টেম্বর হরিণঘাটার বড় জাগুলিয়া মোড়ে কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের উদ্যোগে প্রায় পাঁচশ' কৃষক জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। ব্যাপক হারে কৃষি-বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির ফলে এমনিতেই কৃষকদের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়, তার উপর পাট ওঠার মরশুমে সরকার নিয়ন্ত্রিত জে সি আই চাষীদের কাছ থেকে যে দামে পাট কিনছে, তা মোটেই লাভজনক নয়। এক মাস আগেও কুইন্টাল প্রতি পাটের দাম ছিল ১৫০০ টাকা। এখন সেটা নেমে দাঁড়িয়েছে ৮০০/৮৫০ টাকা। ফলে চাষীদের এই ভরা মরশুমে একেবারে সর্বস্বান্ত হওয়ার অবস্থা। এই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকদের মনের ক্ষোভকে প্রতিবাদের ভাষা দিয়ে পাষাণ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই কে কে এম এস এই অবরোধ কর্মসূচির আয়োজন করেছিল। হরিণঘাটা ব্লকের পানপুর, সাতবেড়িয়া, বিজরা, কাষ্ঠডাঙ্গা, রায়খাস, বৈকারা, দত্তপাড়া সহ অন্যান্য গ্রাম থেকে কৃষকরা এই অবরোধে অংশগ্রহণ করেন। বিশিষ্ট কৃষকনেতা কমরেডস্ কমল মুন্সী, প্রভাত পাল, আয়ুব আলি মণ্ডল, জ্যোতিষ মণ্ডল, দীপঙ্কর মণ্ডলের নেতৃত্বে অবরোধ শুরু হয়। অবরোধে অংশগ্রহণকারী শত শত কৃষক দাবি তোলেন — অবিলম্বে সরকারকে কৃষকদের এই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে। কৃষি-বিদ্যুতের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার এবং ৫০ পয়সা ইউনিটে বিদ্যুৎ দেবার অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিও তাঁরা তুলে ধরেন। প্রতিবাদের নিদর্শনস্বরূপ তাঁরা অনেক কষ্টে, পরিশ্রমে, অনেক ঘাম ঝরিয়ে বোনা পাটের গাদায় আগুন ধরিয়ে দেন।

কিন্তু না। কৃষকদের সমবেত কান্নাভেজা প্রতিবাদ গলাতে পারেনি সরকারি কর্তাব্যক্তিদের মন। সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা তখন ঠাণ্ডা ঘরে বসে সালিম-মিত্তাল-আম্বানিদের কাছে চাষের জমি বেচে দেবার ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত। তাদের সময় কোথায় চাষীমজুরের দাবি শোনার ! তাই তাদের প্রতিনিধি হিসাবে এসে বিরাট পুলিশবাহিনী শুরু করল অবরোধকারীদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর এই লাঠিচার্জে বাধা দিতে চেষ্টা করেন উপস্থিত কৃষকরা। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, সরকারের তথা সি পি এম-ফ্রন্টের পেটোয়া পুলিশবাহিনী আন্দোলনকারীদের নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে কমরেডস্ প্রভাত পাল, শ্যামলী মুন্সী, কাকলি খাতুন সহ মোট ১০ জন আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। পুলিশের লাঠির আঘাতে ৮০ বছরের বৃদ্ধ কৃষক কার্তিক সাধু সহ বহু কৃষক ও মহিলা কর্মীও আহত হন।

এখানেই শেষ নয়। অবরোধ হঠিয়ে দেবার প্রায় আড়াই ঘন্টা পরে, অবরোধস্থল থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে হরিণঘাটা রায় রোডের ধারে বসে যখন কে কে এম এসের সদস্যরা পরবর্তী পরিস্থিতি সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন আচমকা সেখানে বিরাট পুলিশবাহিনী হানা দেয় এবং কে কে এম এস কর্মীদের ঘিরে ধরে পুনরায় ব্যাপক লাঠিচার্জ শুরু করে। সি পি এম নেতারা বলেছিলেন, এ রাজ্যে গুরগাঁও হয় না ; হরিণঘাটার এই ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল এ রাজ্যেও গুরগাঁও হয় ; সাথে সাথে সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের পুলিশবাহিনীর ফ্যাসিস্ট চরিত্রকে প্রমাণ করল। ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে ন্যক্কারজনক পুলিশি হামলার প্রতিবাদে এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের পক্ষ থেকে পরদিন ১৬ সেপ্টেম্বর হরিণঘাটা থানা এলাকায় ১২ ঘন্টা বন্‌ধের ডাক দেওয়া হয়। এস ইউ সি আই এই বন্‌ধকে সমর্থন জানায়। বন্‌ধে এলাকায় ব্যাপক সাড়া পড়ে।

গ্রেপ্তার হওয়া কে কে এম এস কর্মীদের নামে পুলিশ অফিসারদের হত্যার চেষ্টা, অগ্নিসংযোগ, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সহ ১০ দফা ধারায় কেস দেওয়া হয় এবং তাঁদের ১ দিন জেল হাজতেও রাখা হয়। এমনকী তাঁদের যাতে জামিন না হয়, সেজন্যও সি পি এম নেতৃত্ব পুলিশ- প্রশাসন তথা বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু কল্যাণী কোর্টের অ্যাডভোকেটরা বলিষ্ঠভাবে আন্দোলনকারীদের পক্ষে দাঁড়ানোয় তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ধৃতরা অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে মুক্তি পান।

এই কৃষক আন্দোলন সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের কৃষকমারা নীতিকে উন্মোচিত করে দিয়ে সঠিক নেতৃত্বে কৃষকদের জোট বাঁধার প্রয়োজনকে তুলে ধরেছে।

বর্ধমান

চাকরির দাবিতে যুব বিক্ষোভ

এস ইউ সি আই লাউদোহা থানা কমিটির উদ্যোগে এলাকার বেকার যুবকদের কাজের দাবিতে ইছাপুর গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হেড়োডোবা গ্রাম সংলগ্ন নবনির্মিত কারখানাগুলিতে ৫ সেপ্টেম্বর বিক্ষোভ ও অবস্থানের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় পাঁচ শতাধিক যুবকের একটি সুসজ্জিত মিছিল কারখানায় পৌঁছানোর পর বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ অবস্থানে বক্তব্য রাখেন ইছাপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড গঙ্গা গরাই এবং ডিওয়াইও'র পক্ষে কমরেড বেলা পাল। এরপর কারখানাগুলিতে কমরেড শান্তি সামন্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশনে যায়। আলোচনার পর মালিকরা প্রতিশ্রুতি দেন যে, লোকনিয়োগের সময় উক্ত প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেই নিয়োগ করা হবে, এর পর অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

পরিবহণ যাত্রী কমিটির প্রতিবাদ

পরিবহণ যাত্রী কমিটির সাধারণ সম্পাদক সদানন্দ বাগল ১৪ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, এবার নিয়ে সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার আঠারো বার ভাড়া বৃদ্ধি করতে চলেছে। ১৯৮৫ সালের ৯ এপ্রিল ইউ এন ও'র 'কনজিউমার প্রোটেকশন অ্যাক্টে'র প্রস্তাব অনুযায়ী, যাত্রী সাধারণের সাথে আলোচনা না করে, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে সরকার ভাড়া বাড়াতে পারে না। এখনও চেন্নাইতে ন্যূনতম বাসের ভাড়া ২ টাকা। ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে পরিবহণের ভাড়া অনেক বেশি।

তাই আমরা দাবি করছি, (১) যাত্রী কমিটিসহ এক বিশেষজ্ঞ কমিটি করে পরিবহণের ভাড়া সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণ করা হোক। (২) পেট্রল ও ডিজেলের উপর কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অতিরিক্ত কর ও সেস এবং পুলিশের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। (৩) যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। (৪) কিলোমিটারের কারচুপি বন্ধ করতে হবে। (৫) কোনও অজুহাতে বাসসহ পরিবহণের ভাড়া বাড়ানো চলবে না।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in